সহনশীলতা ও ঐক্য

বাংলাদেশে সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা

ঐক্যে নিরাপত্তা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি নির্দেশিকা

সহনশীলতা ও ঐক্য

বাংলাদেশে সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা

ঐক্যে নিরাপত্তা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি নির্দেশিকা

ইংরেজী থেকে অনুবাদ
হুমায়রা ফাতিমা
হুমায়ুন হাশিম
সুমন কায়সার
নাঈম জাকারিয়া

জিজাইন
তুষার/দৃক

প্রোডাকশন
দৃক, বাংলাদেশ (publication@drik.net)

কভার ফটো
আজিজুর রহীম পিউ/*দৃকনিউজ*

International Federation of Journalists (IFJ)
Residence Palace, Block C
155 Rue de la Loi
B-1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 235 22 00
Fax: +32 2 235 22 19
Email: ifj@ifj.org
Website: www.ifj.org

IFJ Asia-Pacific
245 Chalmers Street
Redfern NSW 2016, Australia
Tel: +61 2 9333 0999
Fax: +61 2 9333 0933
Email: ifj@ifj-asia.org
Website: www.ifj-asia.org

এই হ্যান্ডবুকে উপস্থাপিত তথ্য ও নিবন্ধ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত।

২০০৮ সালের জানুয়ারিতে আইএফজে বাংলাদেশে চারটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কর্মীরা অংশ নেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রদান করে দৃকনিউজ। একইভাবে যশোর ও রংপুরে সহযোগিতা প্রদান করে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ)। এসব গোলটেবিল আলোচনা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ বেরিয়ে আসে, যা এই হ্যান্ডবুকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আইএফজে ধন্যবাদ জানাচ্ছে জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা এবং বাংলাদেশ জার্নালিস্টস রাইটার্স ফোরামকে (বিজেআরএফ)। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নও (ডিইউজে) এব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছে। এছাড়া ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সহযোগিতার কথা আইএফজে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে।

এই হ্যান্ডবুকের অংশ বিশেষের ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের মধ্যে পরিচালিত একটি সমীক্ষা। আর এই সমীক্ষাটি চালিয়েছে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি)। এজন্য আইএফজে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিসিডিজেসি প্রেসিডেন্ট নাঈনুল ইসলাম খান এবং সেইসঙ্গে বিসিডিজেসি'র মাঈনুল ইসলাম খান, হাসিবুল ফারুক চৌধুরী এবং জান্নাতুল জাহানকে।

বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চিন্তা ও গবেষণার ফসল এই হ্যান্ডবুক। বিশেষকরে যাঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয় তারা হচ্ছেন Jake Lynch এবং Annabelle McGoldrick, Fiona Lloyd এবং Peter du Toit, Robert Karl Manoff, Melissa Bauman, Sunanda Deshapriya, Chiranjibi Khanal এবং Binod Bhattarai.
যেসব পাঠক এই হ্যান্ডবুকে আলোচ্য বিষয়ে আরো গভীরভাবে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ রয়েছে।

- Transnational Foundation for Peace and Future Research.
- Centre for War, Peace and the News Media, New York University.
- Media Peace Centre, South Africa.
- Nepal Press Institute
- Free Media Movement, Sri Lanka

এই হ্যান্ডবুক রচনায় আইএফজে কর্মী Deborah Muir (Sydney) এবং Sukumar Muralidharan (Delhi)-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ইউনাইটেড স্টেট ইন্সটিটিউট অব পিস (ইউএসআইপি) এর আর্থিক সহযোগিতায় এই হ্যান্ডবুক প্রণীত হয়েছে। এতে উপস্থাপিত মতামত, সমীক্ষা, সুপারিশমালা ও নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট লেখকের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। যা কোনো অবস্থাতেই ইউএসআইপি'র দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।

সহনশীলতা ও ঐক্য

বাংলাদেশে সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা

ঐক্যে নিরাপত্তা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি নির্দেশিকা

সূচীপত্র

সহনশীলতা ও ঐক্য

সূচনা ৬

অধ্যায় ১ ১০

সংঘাত এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম

সংঘাতের কবলে দেশ ◆ সংঘাত কি? ◆ সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিং

অধ্যায় ২ ১৮

সাংবাদিকতার ভূমিকা

শান্তির এজেণ্ডা: বস্তুনিষ্ঠতা এবং সত্য ◆ সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় সাংবাদিকদের কর্তব্য ◆ সত্যের কাছে যাওয়া ◆ তথ্যের উৎস সন্ধান ◆ নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য যা দরকার ◆ প্রেক্ষাপট ◆ প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে যাতে নজর দিতে হবে ◆ বস্তুনিষ্ঠতা ◆ ভারসাম্য নিশ্চিত করতে যা দরকার ◆ ভাষা ◆ ভাষার ব্যাপারে সাবধানতা

অধ্যায় ৩ ৩২

সবার মতামত শোনা

মিডিয়ার মনোযোগ পাওয়া নিশ্চিত করা ◆ সোর্স: অনুসরণীয় বিধি ◆ জাতিগত পরিচয় ◆ জাতিগত, ধর্মীয় বা বর্ণগত পরিচয় উল্লেখ কি করতেই হবে? ◆ জাতিগত পরিচয়ের ব্যাপারে যা যা মনে রাখা দরকার ◆ লৈঙ্গিক সতর্কতা ◆ শিশু ◆ বার্তাকক্ষে বৈচিত্র্য ◆ খবরের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ◆ তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ ◆ যাচাই করে দেখার বিষয় ◆ অনুসরণীয় সতর্কতা

অধ্যায় ৪ ৪৪

নৈতিকতা সচেতন সাংবাদিকতা হবে সংঘাত-সংবেদনশীল

সাংবাদিকদের প্রয়োজন একটি গাইডলাইন ◆ সংঘাত বিষয়ক প্রতিবেদনের গাইডলাইন ◆ সাংবাদিকদের আচরণবিধি সম্পর্কে আইএফজে-র নীতিমালা ◆ অঙ্গীকার আর অসঙ্গতি ◆ হিন্দুদের সম্পত্তি আজও "অর্পিত" সম্পত্তি

ঐক্যে নিরাপত্তা

ভূমিকা ৫৬
এই হ্যান্ডবুক সম্পর্কে

অধ্যায় ১ ৫৮
সাংবাদিকদের নিরাপত্তার মৌলিক বিষয়গুলো
নিরাপত্তার গুরুত্ব ◆ সরকারের ভূমিকা ◆ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আচরণবিধির পথে অভিযাত্রা

অধ্যায় ২ ৬৪
বৈরী পরিবেশে কাজ করার প্রস্তুতি
প্রধান ঝুঁকিগুলো ◆ অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে ◆ ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রস্তুতি ◆ নিজের অধিকার জানুন ◆ সামাজিক সুরক্ষা ◆ সংবাদ ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ লাইন ঠিক করুন ◆ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে নিন ◆ সাংবাদিক হিসাবে লক্ষ্যবস্তু হওয়া ◆ অপহৃত ও জিম্মি হলে যা করণীয় ◆ জেনেভা কনভেনশন ◆ বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি কী আচরণ করা যাবে, কী করা যাবে না

অধ্যায় ৩ ৭৮
দাঙ্গা ও গণ অসন্তোষ
নিরাপদ থাকার কৌশল ◆ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ◆ অবস্থান গ্রহণ ◆ ঘটনার সময় ◆ ঘটনার পর ◆ সন্ত্রাসবাদী হামলা

অধ্যায় ৪ ৮৮
জরুরি চিকিৎসা সেবা ও স্নায়বিক চাপ মোকাবেলা
মানসিক আঘাত-পরবর্তী চাপ মোকাবেলা ◆ ঘটনা শেষ হলেও সমস্যা থেকেই যায়

অধ্যায় ৫ ৯৬
প্রতিরোধ: আইএফজে এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলো যা করতে পারে
অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময় ◆ দেশের ভেতরে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ◆ বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা কর্মসূচি ◆ জাতীয় সংগঠনগুলোর ভূমিকা

সহনশীলতা ও ঐক্য

বাংলাদেশে সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা

হ্যান্ডবুক
২০০৮

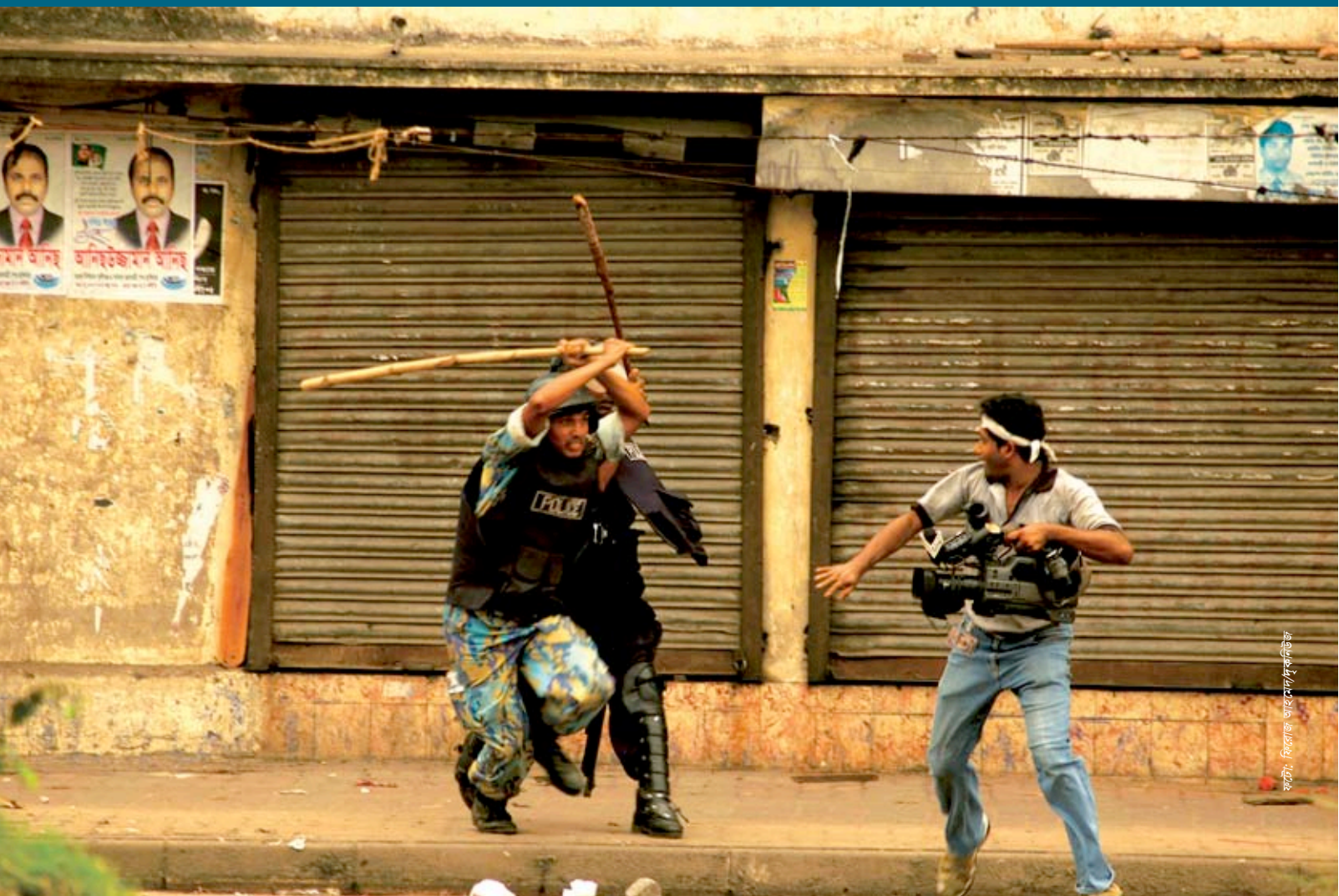

ফটো: সিদ্দিকুর রহমান/শহিদুল আলম

সূচনা

As we rush down the slope of hate with gladness
You trip us up like an unnoticed stone,
And just when we are closeted with madness
You interrupt us like a telephone.

_____ W.H.Auden

সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য সবসময় ঘড়ির কাটার সঙ্গে লড়তে হয়। আগ্রহোদ্দীপক খবর সরবরাহের এই তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে নির্ভুলতা ও সত্যের দিকেও নজর রাখতে হয় সাংবাদিককে। সাংবাদিকতার ধারণাটি বিভিন্ন সময় ছিল বিভিন্ন রকম। প্রচারমাধ্যম একটি শিল্পে (বাণিজ্যিক অর্থে) পরিণত হওয়ার পর থেকে সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের মনোভাব বদলেছে।

প্রচারমাধ্যমের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে সাংবাদিকতার ভূমিকা কার্যত বিজ্ঞাপনী শিল্পের সহায়কের স্থানে পর্যবসিত হয়েছে। এ শিল্পের মুনাফা আসে বিজ্ঞাপন থেকেই। কিন্তু যেসব সাংবাদিক নিজের পেশার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এর ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জনগণকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

এমনকি শান্তির সময়েও সাংবাদিককে যেসব জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে তার মাত্রা আরো অনেক বেড়ে যায়। সাংবাদিকতার কাজ হচ্ছে সমাজের মানুষকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া। আর সংঘাত সেই অধিকারটাই কেড়ে নেয়। মিডিয়া সংঘাতের শিকার মানুষকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে পারে বলেই বিবদমান পক্ষগুলো একে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সংঘাত বলতে কেবল সহিংসতাই বোঝায় না, অন্য পক্ষের কথা শোনার ব্যাপারে অনাগ্রহও এক ধরনের সংঘাত। সেন্সরশিপ হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ ঘটনা, তা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েই হোক বা সাংবাদিক ও তার পরিবারের ওপর হুমকির মতো অনানুষ্ঠানিক কায়দায়ই হোক। নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলে সংঘাতের জন্য অনুকূল উপাদানগুলো চাঙ্গা হয়। সাংবাদিকরা তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ে।

সংঘাতের অন্যতম প্রথম বলি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বৈরথের মধ্যে আটকা পড়লে এবং নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে পেশাগত মনোবল হারিয়ে ফেলেন সাংবাদিকরা।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলে জনগণও তাদের কথা বলার অধিকার হারিয়ে ফেলে। নিষ্পত্তি করা হয়ে পড়ে আরো কঠিন। যুক্তিসঙ্গত অভিমত দেওয়া থেকে কাউকে বঞ্চিত করা সংঘাত সমাধানের উপায় হতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় যে, সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলো যখন দেখে মিডিয়ার মাধ্যমে লোকে তাদের কথা শুনছে কেবল তখনই খোলামেলা সংলাপে আগ্রহী হয় তারা। সংলাপের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনা।

কাজেই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা যেসব পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে ঠিক তখনই এর প্রয়োজনীয়তাও সবচেয়ে বেশি।

সংঘাতপীড়িত সময়ে জনগণকে নির্ভরযোগ্য তথ্য যোগাতে হলে চাই খুবই উঁচু মানের সাংবাদিকতা- তা সে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রকাশ্য বা সূক্ষ্ম যেরকমই হোক না কেন। দৃশ্যমান ও সহিংস ধরণের সংঘাত অনেক প্রাণহানি এবং মানবিক দুর্ভোগ ঘটায় যা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু যেসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে নীরবে বয়ে চলে তা শাসন প্রক্রিয়াই অচল করে দিতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে জনগণ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ঝুঁকে পড়তে পারে গায়ের জোরের নীতির দিকে। এসব কর্মকাণ্ড সংঘাত পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে বিবদমান রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক বৈরিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কোনো একটি সংঘাতের কারণ সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকেবহাল জনগোষ্ঠীর পক্ষেই কেবল এটা বোঝা সহজ যে, বৈরিতার দুষ্ট চক্রকে লালন করলে আসলে লাভ নেই। এজন্য সংঘাতের কারণ এবং তা কিভাবে বিকশিত হয় সে সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে হবে সাংবাদিকদের।

সর্বোপরি, কিভাবে সংঘাতের অবসান ঘটানো যায় তা-ও জানতে হবে সংবাদকর্মীকে। সাংবাদিক এবং প্রচারমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানতে হবে সংঘাতের কারণ ও সমাধান কোথায় খুঁজতে হবে। জনগণের কাছে এসব তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সাংবাদিকরা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মূল কারণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকেবহাল করতে পারেন।

বাংলাদেশে জাতীয় জীবনে সংঘাতের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ক্ষমতার রাজনীতি, আন্দোলন আর পার্বত্য চট্টগ্রামের (এখন যা কমে এসেছে) বিদ্রোহ তৎপরতায়। সাধারণত নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই দলীয় আবেগ-উত্তেজনা ক্রমশ স্তিমিত হয় এবং ভোটাভুটি শেষ হয়ে গেলে সব দল ফলাফল মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলতে সম্মত হয়।

তবে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয় যখন দলীয় উত্তেজনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে সংঘাত হয়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের অংশ যাতে শাসনপ্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোটা সমাজের উপকারার্থে গৃহীত কর্মসূচিকে নস্যাৎ করে তা একটি একক গোষ্ঠীর দলীয় স্বার্থের উপযোগী করে তোলা হয়। দারিদ্র্য শেকড় গেড়ে বসে। এরকম পরিস্থিতিতে বিবদমান পক্ষগুলোর মনোযোগ অন্যদিকে থাকে বলে লৈঙ্গিক সাম্য ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মতো সামাজিক সংস্কারের কাজ উপেক্ষিত হয়।

বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে বাংলাদেশের দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে সাংবাদিক সমাজ ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকদের আগে জানতে হবে তাদের ভূমিকাটা কী হবে। শুধুমাত্র সংঘাতের ওপর মনোনিবেশ করলে সাংবাদিকের অবস্থা হবে শুধুমাত্র রোগবালাইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী একজন 'স্বাস্থ্য প্রতিবেদকের' মতো। তাকে তখন আর 'স্বাস্থ্য প্রতিবেদক' না বলে 'রোগবালাই প্রতিবেদক' বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে। সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণ ও তার সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে না ভেবে যে প্রতিবেদক শুধু ঘটনার বিবরণীতে সীমাবদ্ধ থাকবেন তার পরিচয়ও সেভাবেই ঠিক হবে।

ঐতিহাসিক কারণে রণাঙ্গন প্রতিবেদকের কাজ সাংবাদিকদের মধ্যে খুবই মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত। বিংশ শতকে পাশ্চাত্য বিশ্বে শিল্প হিসেবে মিডিয়ার বিকাশ আর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সংঘাত সমান্তরালে ঘটা এর অন্যতম কারণ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'শান্তি সাংবাদিকতা' কখনোই অনুরূপ পেশাগত মর্যাদা পায়নি। এর আংশিক কারণ হচ্ছে মিডিয়া শিল্প হয়ে ওঠার পর থেকে সাংবাদিকরা নিজেদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে বিশ্বজুড়ে সংঘাতের চিত্রটি দেখলে সহজেই বোঝা যাবে বড় ধরণের সংঘাতগুলো এখন রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে নয়, বরং ঘটে রাষ্ট্রের নিজের সীমানারই ভেতরে। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিকটবর্তী বিষয়গুলোর প্রতিই সাংবাদিকদের বেশি মনোযোগ কামনা করে। প্রথাগতভাবে যাকে 'জাতীয় স্বার্থ' বলা হয় তার প্রতি তাগিদটা এখন কম।

এজন্য সাংবাদিকদের যে দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন এই হ্যান্ডবুকটি তার দ্বার হিসেবে কাজ করবে।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (আইএফজে) কর্তৃক ২০০৭ ও ২০০৮ সালে পরিচালিত কর্মশালার অভিজ্ঞতা এবং একই প্রকল্পের অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে এই হ্যান্ডবুকটি তৈরি হয়েছে। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি পরিচালিত ওই জরিপে ৬০ জন কর্মরত সাংবাদিকের মতামত সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ জন প্রিন্ট মিডিয়া, ১২ জন টিভি, ১০ জন বেতার এবং ৩ জন ছিলেন অনলাইন মিডিয়ার। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৫ জন কর্মরত ছিলেন প্রতিবেদক থেকে বার্তা সম্পাদক পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বে। বাকিরা বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক। নয়জন ছিলেন ইংরেজি ভাষার সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক এবং বাকিরা বাংলা অথবা মিশ্র। জরিপের আওতা ছিল দেশের তিনটি বিভাগীয় সদর: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী।

বিশ্বের অন্যান্য অংশে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সাপোর্ট (আইএমএস) এবং ইন্সটিটিউট ফর মিডিয়া পলিসি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি (আইএমপিএসিএস) অনুরূপ কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। সংঘাতের হুমকির মুখে থাকা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ প্রতিবেদক ও সম্পাদকরা এসব জরিপে যুক্ত ছিলেন।

এ হিসেবে এ হ্যান্ডবুকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইএফজে'র অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। এটি আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি তথ্যনির্দেশ ও স্মারক হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের

প্রত্যাশা। এ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের পেছনে একটি মূল ভাবনা বা নীতি কাজ করেছে। তা হলো: বিভিন্ন মাত্রার সংঘাতের বিষয়ে সংবেদনশীল সাংবাদিকতা মানুষের দুর্ভোগ হ্রাস এবং সমাজের মধ্যকার অসঙ্গতি দূর করতে সহায়তা করতে পারে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে হাতের কাছে থাকা দক্ষতাকে এখনো কাজে লাগানো হয়নি। আইএফজে এ প্রকল্পের কাজ চালাতে গিয়ে দেখেছে এ বিষয়ে বাংলাদেশে অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোকের অভাব নেই। এ দক্ষতার কিছু এ হ্যান্ডবুকে প্রতিফলিত হয়েছে। আশা করা যায় আগামী সংস্করণগুলোতে এটি আরো ভালোভাবে প্রতিফলিত হবে এবং এর মাধ্যমে সংঘাত সংবেদনশীলতার বিষয়টি বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যমের কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হবে।

এই হ্যান্ডবুক ব্যবহার করে আপনার নিজের বার্তাকক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। স্থানীয় সাংবাদিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রেস ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরতে পারেন এর আলোকে। এছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনার সূচনা করা যেতে পারে যা কিনা প্রতিবেদনের মান, সংবাদ পরিবেশনের বৈচিত্র্য ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বাড়াবে।

শেষত: রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যম মালিকরা এ হ্যান্ডবুকটি পড়লে জানতে পারবেন কেন সাংবাদিকরা সংবাদপত্র ও সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে এত গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। জনকল্যাণে স্থায়ী অবদান রাখতে ইচ্ছুক সৎ রাজনৈতিক নেতাদের কেন মিডিয়ার বহুমুখীনতা, সরকারের স্বচ্ছতা এবং সাংবাদিকদের মধ্যে স্বাধীনতা ও রোমাঞ্চের চেতনাকে উৎসাহিত করা দরকার সেটাও বুঝতে পারবেন তারা।

অধ্যায় ১

সংঘাত এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংঘাতের, যার মূল বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের সংস্কৃতি এবং চলমান জরুরি অবস্থা, একটি গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সমাজের ব্যাপক অংশে। সেইসঙ্গে তা স্থানীয় গণমাধ্যমকে সংঘর্ষ ও মেরুকরণের রাজনীতির অশুভ চক্রের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

একদিকে, সাংবাদিকদের অবশ্যই সংঘাত মোকাবিলা করতে হবে তারা নিজেরাই যার সরাসরি লক্ষ্যবস্তু । তারা যখন সরকারের সদস্য, রাজনৈতিক মাফিয়া, আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং অপরাধীদের দ্বারা ভয়ভীতি, হামলা ও সেন্সরশিপের মুখোমুখি হন তখনই তারা সংঘাতের সরাসরি লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সরকারি দমন-পীড়ন এবং সেলফ-সেন্সরশিপের কারণে প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগ পর্যন্ত সময়কাল) বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত চাপের মুখে ছিল। ওই সময় সাংবাদিকরা দুর্নীতির অভিযোগ এবং সরকারের অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করায় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের মৌখিক আক্রমণ ও হয়রানির শিকার হয়েছেন।

শুধুমাত্র ২০০৬ সালেই ২৩৮টি পৃথক ঘটনায় অন্ততঃ ৪৬২ জন সাংবাদিক হামলা অথবা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৪৭ জনের ওপর শারীরিক হামলা হয় এবং ৭৩ জনকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ৪৩টির মতো মামলা দায়ের করা হয়, যাতে অন্ততঃ ১৩৭ জন সাংবাদিককে আসামী করা হয়। বাংলাদেশে অপরাধ করেও দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি বিদ্যমান বলে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই।

পরিস্থিতি যখন বৈরী হয়ে উঠে, তখন সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই একথা মেনে নিতে হবে যে, সংঘাতকে উস্কে দিতে তারা নিজেরাও অবদান রেখেছে। নেতিবাচক দিককে তুলে ধরে রিপোর্টিং, গৎবাঁধা কথা, ধারণা বা বিশ্বাসের আশ্রয় নেওয়া, কারো পক্ষ নেওয়া এবং সংঘাতের মূলে নিহিত কারণ উদঘাটন অথবা সংঘাত নিষ্পত্তির ইতিবাচক বিকল্পগুলো তুলে ধরায় ব্যর্থতা– এধরণের সব পরিস্থিতিতেই গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হুমকির মুখে পড়ে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন হারিয়ে ফেলে। ফলে গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ হলেও সমাজে সেরকম জোরালো প্রতিবাদ হয় না যা কিনা গণমাধ্যমের অধিকার রক্ষার জন্য সহায়ক।

সংঘাতের কবলে দেশ

'নিরাপদ' রিপোর্টিংয়ের সীমারেখার ব্যাপারে গণমাধ্যমের অভ্যন্তরে বহুমুখী অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে সকল টেলিভিশন চ্যানেলে টেলিফোনে নির্দেশ আসে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংবাদ ও চলতি ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে

বিক্ষোভ চলাকালে রাজনৈতিক কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুল (তামাকের গুড়া) ছোঁড়ে। এমন অবস্থায় সংবাদকর্মীরা প্রায়শঃ মাঝখানে পড়ে পরিস্থিতির শিকার হন। (ঢাকা, ২০০৬)
ফটো: আবির আব্দুল্লাহ

অনুষ্ঠানগুলো স্থগিত থাকবে। এই মৌখিক নির্দেশ প্রধানতঃ ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হলেও তার একটা শীতল প্রভাব প্রিন্ট মিডিয়ার ওপরও পড়ে।

পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণমাধ্যমের সঙ্গে একটি অধিকতর স্বস্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু এই স্বস্তির পরিবেশ বজায় রাখতে তারা আপাতঃদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

২০০৭ সালের এপ্রিলে সংবাদমাধ্যম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের সংবাদ পরিবেশন শুরুর সাথে সাথেই কর্তৃপক্ষ জরুরি বিধিমালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের প্রতি সতর্কবাণী পাঠায়। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে অন্তর্বর্তী প্রশাসন এই বিশেষ বিধিমালার আশ্রয় নেয়। এরপরই গণমাধ্যম সংবাদ প্রচারে নমনীয় নীতি অবলম্বন করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কারণে গণমাধ্যম অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে কথিত দুর্নীতির অভিযোগে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ১১ জন পরিচালক এবং উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই জামিন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। এতে তাদের প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে বেতন পরিশোধ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। মিডিয়া অঙ্গনে দেখা দিয়েছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশা।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর জরুরি অবস্থার কী প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে অনেক সাংবাদিকই প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে এটা পরিষ্কার যে, সেলফ-সেন্সরশিপ চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইন্সটিটিউট (দক্ষিণ এশিয়া), ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে গৃহীত।

বাংলাদেশ: জরুরি অবস্থা, মিডিয়া পরিস্থিতি এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

সংঘাত কি?

সংঘাতময় পরিস্থিতিতে, হতে পারে তা সর্বাত্মক যুদ্ধ অথবা সাধারণ সামাজিক সংঘাত, সাংবাদিকরা দু'ভাবে ঝুঁকির মুখে – তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তাদের পেশাগত সততা। যেকোনো সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও উপর্যুপরি গুজবের মোকাবেলা করতে হবে। সংঘাত মোকাবিলা এবং সংঘাত সম্পর্কে সংবেদনশীলতার সঙ্গে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সাংবাদিকদের সাহায্য করতে পারে।

নানারূপে সংঘাতের আবির্ভাব ঘটে। সংঘাত মানেই সাংবাদিকদের কাছে মনে হতে পারে সর্বাত্মক যুদ্ধ, তা দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও হতে পারে, অথবা রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়। তবে অধিকাংশ সাংবাদিকই তাদের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে কোনো না কোনো

রকম সংঘাত মোকাবেলা করবেন, হয়তো তা হবে সর্বাত্মক সামাজিক আন্দোলন এবং যুদ্ধ, অথবা অপরাধ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে রিপোর্ট করা। গার্হস্থ্য সহিংসতা এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধ থেকে শুরু করে দুটি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে বিরোধ পর্যন্ত সংঘাত বিতৃত।

সব সংঘাতই সহিংস নয়। সব সংঘাত রাজনৈতিক নয়।

সব সহিংসতাই রাজনৈতিক নয়। সব সহিংসতা সংঘাত নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহিংসতা হতে পারে স্রেফ অপরাধ সম্পর্কিত। 'অপরাধ' যদিও সংঘাতের একটি রূপ, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য আইনি ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যকার সংঘাত। প্রায়শঃ 'অপরাধ' বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে তা হতে পারে সেই আইনি ব্যবস্থার পরিণতি যা কিনা উপলব্ধির বৈচিত্র্য অনুধাবনে ব্যর্থ আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'অপরাধ' হচ্ছে নির্লজ্জ দলীয় বিবেচনা অথবা পক্ষপাতদুষ্টভাবে বলবৎ আইনি ব্যবস্থারই পরিণতি।

অপরাধের অন্তর্নিহিত কারণও রয়েছে। অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে সাংবাদিকদের উচিত অপরাধের অন্তর্নিহিত কারণ কী তা অনুধাবনের চেষ্টা করা। একটি প্রবাদ আছে- সমাজে কোনো কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়, শুধু পরিবর্তন ছাড়া। যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই সংঘাত অনিবার্য, কারণ এই পরিবর্তন কারো কারো জন্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে, আবার অন্যদের জন্য তা অসুবিধার কারণ হতে পারে। শান্তিপূর্ণভাবে এই ভিন্নমতের সুরাহা হতে পারে। আবার তা সহজেই সহিংসতা এবং যুদ্ধের রূপও নিতে পারে।

সংঘাতের মূলে রয়েছে ক্ষমতা। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গ্রুপ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে পরস্পরকে বাধা হিসেবে গণ্য করে তখনই সংঘাতের জন্ম হয়। আর এই লক্ষ্য হতে পারে কোনো পার্থিব বস্তু লাভ বা কোনো আইডিয়া বা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা। বেশিরভাগ সাংবাদিক এই বিষয়টি অনুধাবন করবেন তাদের কাজের মধ্য দিয়ে। অবশ্য তারা হয়তো সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবনে গভীরতর অনুসন্ধানে যেতে পারেন না, অথবা তাদের রিপোর্টে সংঘাত নিষ্পত্তির উপায় সংক্রান্ত তথ্য সচেতনভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস নেন না। তবুও সাংবাদিকরা আরো সুচারুভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন, যদি তারা গভীরভাবে সংঘাত বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করে সেই তথ্য অন্যকে জানাতে পারেন। সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন রয়েছে এমন তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে সাংবাদিকরা সংঘাত হ্রাসে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাংলাদেশে আইএফজের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান অথবা গৃহযুদ্ধকবলিত রাষ্ট্রের প্রথাগত সংজ্ঞা অনুসারে এখানকার অধিকাংশ সাংবাদিক তাদের দেশকে সংঘাতপ্রবণ মনে করেন না। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘাতকে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়কে ঘিরে মাঝে-মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে তা ছাড়া বাংলাদেশে জাতিগত অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কোনো স্থায়ী সংঘাত আছে বলেও তারা মনে করেন না।

অবশ্য সমীক্ষায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ সাংবাদিকই বিশ্বাস করেন, ক্ষমতার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং দেশের অভ্যন্তরের অন্তর্নিহিত উত্তেজনার কারণে সংঘাত বাংলাদেশে একটি অনস্বীকার্য বিষয়।

সাধারণভাবে একটি সমাজের অভ্যন্তরে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংঘাত হয়ে থাকে তার উৎসগুলো হচ্ছেঃ

- সম্পদের অভাব
- অত্যাবশকীয় সম্পদ যেমন খাদ্য, আবাসন, চাকরি, ভূমি, পানি- এসব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চনা
- ক্ষমতার অন্যায্যতা
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত যোগাযোগ অথবা যোগাযোগের অভাব
- নিজের বাইরে অন্য গোষ্ঠী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং
- ঐতিহাসিক শত্রুতা এবং ক্ষোভ

ক্ষমতা এবং সম্পদ বন্টনে বৈষম্য জাতিগত গ্রুপিংসহ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। বিভিন্ন গ্রুপের (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অথবা জাতিগত) মধ্যে যোগাযোগ ভেঙে পড়লে এবং অতীত ক্ষোভের নিষ্পত্তি না ঘটলে সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দেয়। অভিন্ন ইতিহাসের ব্যাপারে ভিন্নমত সংঘাতের উৎস হতে পারে, যেমন ভিন্নমত রয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অবসানের ঊষালগ্নে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি সম্পর্কে।

বাংলাদেশের সব নাগরিকই পরিবর্তন চায়, যা তাদের জীবনকে উন্নততর করবে। তবে এটা প্রতীয়মান যে, পরিবর্তন-প্রত্যাশী সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘাত সংশ্লিষ্ট। কিছু লোক পরিবর্তন চায় এবং অন্যরা তা চায় না। নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে সমাজের মধ্যে ঐকমত্যের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিত্রিত করতে চায়। তবে তারা প্রায়শ নির্বাচনী রায়কে রাজনৈতিক ম্যাণ্ডেটে রূপান্তরিত করার অসুবিধাগুলোকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। তারা পপুলার ভোটের জটিলতাকে উপেক্ষা করে এবং এইভাবে সমাজের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির বৈচিত্র্য থাকে তা চাপা পড়ে যায়। এই রাজনৈতিক ঐকমত্যের অজুহাতে সংঘাতকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ছুতো যখন ঠুনকো হয়ে যায় তখনই সংঘাত আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দেয়।

মতভেদের সুরাহা হতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে অথবা তা সহিংসতা এবং যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। সমাজে সংঘাত মোকাবিলা ও তার নিষ্পত্তির উপায়ের ঘাটতি দেখা দিলে সহিংসতার প্রকাশ ঘটতে পারে।

আপাতদৃষ্টে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের বহিরঙ্গের ঠিক নিচেই ওঁৎ পেতে থাকতে পারে সংঘাত; ফলে বিবদমান বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে উপর্যুপরি সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সহিংস সংঘাতে জনগণ তাদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকে।

সংঘাতের নিষ্পত্তি না হলে তা সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ সংঘাতে সহিংসতা থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুর বাইরেও এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যখন একটি শিশু তার পারিবারিক বিরোধের পরিণতি ভোগ করে বা ব্যবসায়ী লবির প্রতিযোগিতার কারণে একটি কমিউনিটির লোক সীমিত পানি সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা অন্যায্যভাবে সম্পদের বণ্টন এবং উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির কারণে একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয় তখন সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাবটি তার কেন্দ্রবিন্দুর সীমা ছাড়িয়ে অনুভূত হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, আইএফজে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ সাংবাদিক মনে করেন, ক্ষমতার রাজনীতির কারণে সৃষ্ট সংঘাতের নিষ্পত্তি সম্ভব। তবে তারা বিশ্বাস করেন, এ জন্য প্রয়োজন মানুষে-মানুষে ব্যাপক যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সমঝোতাকে উৎসাহিত করা। আর এর ফলে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ওপর তাদের মধ্যকার মতবিরোধ নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা সংঘাত বিষয়ক রিপোর্টিংকে উন্নত করার উপায় হিসেবে সুস্পষ্ট পেশাগত নীতিমালা এবং আচরণবিধি প্রণয়নের পক্ষেও মত দিয়েছেন।

সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিং

আইএফজে সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ সাংবাদিক জানিয়েছেন, দৈনন্দিন পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সব সাংবাদিকের মধ্যে-

- ৬৬ শতাংশ পূর্ববর্তী ১২ মাসে সংঘাত নিয়ে ১০টিরও বেশি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন
- ১৮ শতাংশ ৬-১০টি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন
- ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ প্রতিবেদন করেছেন ১টি থেকে ৫টির মধ্যে
- ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ পূর্ববর্তী বছরে কোনো সংঘাত পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি অথবা সংঘাত নিয়ে কোনো প্রতিবেদন তৈরি করেননি

৮০ শতাংশেরও বেশি সাংবাদিক বিশ্বাস করেন যে, সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিঙের ব্যাপারে যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে তারা এক্ষেত্রে আরো দক্ষ হবেন।

অধ্যায় ২

সাংবাদিকতার ভূমিকা

সংঘাতের নিষ্পত্তি করা সাংবাদিকের কাজ নয়। এরপরও সমাজের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনাকে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যায়ক্রমে তা বহুত্ববাদী রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন ইস্যু, নীতিমালা এবং কৌশল সম্পর্কে জনগণকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গণমাধ্যম উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি এবং অজ্ঞতা ও ভয় হ্রাস করতে পারে, যেসব বিষয় সমাজে ভুল বোঝাবুঝি ও বৈরিতাকে উস্কে দেয়।

আর তা করতে হলে, সাংবাদিকদের সংঘাতের উৎস ও কারণসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সমস্যা সমাধানকল্পে আলোচনা ও বাস্তবানুগ সুপারিশমালা সম্পর্কে কার্যকর ও বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের জন্য এটি প্রয়োজন। সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে, একজন সাংবাদিক যিনি শুধুমাত্র নিরাভরণ তথ্য বা ঘটনার রিপোর্ট করেন, এবং অন্য একজন সাংবাদিক যিনি এসব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেন ও প্রশ্ন করেন– এই দুই সাংবাদিকের মধ্যে এক বিশাল ফারাক রয়েছে। জনগণের কাছে এর মূল্য বিচারে, যে সাংবাদিক সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণ ও সাধারণ মানুষের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তিনি উল্লিখিত অন্য সাংবাদিকের চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখেন।

নিরাভরণ তথ্য বা ঘটনা থেকে শুধুমাত্র সীমিত ধারণা পাওয়া যায় এবং তা পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাবে সৃষ্ট পূর্ব ধারণাকে উস্কে দিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে গণমাধ্যম সমাধানের আইডিয়াসমৃদ্ধ কোনো গভীর মূল্যায়ন তুলে ধরলে তা জনগণকে একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করতে পারে। তা সম্ভবত জনগণকে ইতিবাচক সমাধান শণাক্ত করার কাজেও প্রবৃত্ত করে। সাংবাদিকের রিপোর্টে যদি প্রশ্ন না থাকে, তা যদি ভারসাম্যহীন হয় ও ভুল তথ্য প্রদান করা হয় তাহলে এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা ভয় ও সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারেন। অথবা তারা 'সংঘাত-সংবেদনশীল' হয়ে সব দিক খতিয়ে দেখতে পারেন। এর ফলে তারা জনগণকে ভালোভাবে অবহিত হতে এবং সংঘাতের একটি সমাধান খুঁজে নিতে আরো বেশি করে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করেন।

শান্তির এজেণ্ডা: বস্তুনিষ্ঠতা এবং সত্য

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি জাগে- সাংবাদিকতায় সত্যের প্রতি অঙ্গীকারের সঙ্গে শান্তির অন্বেষা সুসঙ্গত কিনা। একজন সাংবাদিকের কি শান্তির জন্য এজেন্ডা থাকতে পারে এবং একই সঙ্গে সত্য ও নিরপেক্ষতার প্রতি তার অঙ্গীকারকেও কি সে সমুন্নত রাখতে পারে? বস্তুনিষ্ঠতার মূল তাৎপর্য হচ্ছে, সাদা চোখে যা দেখা যায় তাকেই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যাবে না। হতে পারে তা কোনো কর্মকর্তার বিবৃতি অথবা তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিজনিত মনোভাবের পরিবর্তন। এ সব ক্ষেত্রে সাংবাদিককে প্রভাবিত না হয়ে সব ধরণের তথ্যকে যাচাই করতে হবে।

'বস্তুনিষ্ঠতা' একটি প্রশংসিত গুণ যা অর্জনের জন্য সাংবাদিকদেরকে একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে আরো যথাযথভাবে অনুধাবন এবং তুলে ধরার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করতে হবে। এরপর ঐ বিষয়ে এমনভাবে রিপোর্ট করতে হবে যাতে করে জনগণ সে সম্পর্কে আরো ভালোভাবে অবহিত হতে পারেন।

সংবাদে ভারসাম্য এবং বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য থাকাটা অপরিহার্য। তবে সাংবাদিকদেরকে তথ্যের জন্য অনেক সময় একটিমাত্র উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং প্রায়শ সেই উৎস হয়ে থাকে সরকারি কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র।

কখনও কখনও এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা থাকলেই সত্যের খোঁজ মিলবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটি বিশেষ করে একটি বিপদ, যখন বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিন্নমতের ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠকদের ওপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিশাস্ত্রবিদ নিল লেভির মতে, বিপদটি হচ্ছে 'ভারসাম্য রক্ষার নির্বিচার প্রয়াস বস্তুনিষ্ঠতাকে নিশ্চিত করে না, বরং তা সরাসরি সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে।'

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, সকল দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সমান নয়, বিশেষ করে সংঘাত পরিস্থিতিতে। তাই সাংবাদিকদের প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের নীতিচেতনার আলোকে ঐ সব বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, গৃহে নারীর প্রতি সহিংসতা যে অন্যায় তা অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করবেন। তাই এ ধরনের সহিংসতায় লিপ্তদের বিশ্বাসযোগ্যতা দান করে সাংবাদিকরা তাদের রিপোর্টিংকে নিরপেক্ষ করতে পারেন না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো প্রপাগান্ডাকে উৎসাহিত করার অনুমতি দেয় না। সাংবাদিকদের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের নিজেদের পক্ষপাতকে ন্যূনতম গুরুত্ব দিয়ে এমনভাবে রিপোর্ট করা যা হবে সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পক্ষপাতহীন।

সত্যের অনুসন্ধান সাংবাদিকতা পেশার প্রধান লক্ষ্য। সাংবাদিকদের এই অঙ্গীকারকে নিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকারের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ করতে হয়। শুধুমাত্র উভয়পক্ষের মতামত জানার বিষয়টি সত্যের অনুসন্ধানকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। সাংবাদিকদের নজর দিতে হয় কীভাবে তারা মানুষকে 'অফিসিয়াল' সত্যের গণ্ডীর বাইরে বাস্তব পরিণতিকে উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারেন যদিও সেই 'সত্য' বস্তুনিষ্ঠভাবেও উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠতার বাইরেও দৃষ্টি প্রসারিত করতে হয় কীভাবে তারা ঘটনার আরো গভীরে যেতে পারেন, বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং সংবাদকে প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে পারেন, যাতে করে পাঠকের কাছে সব প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছায় এবং তারা 'তথ্যের কারসাজি' কী , কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তা বুঝতে পারেন।

সংঘাত নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় সাংবাদিকদের কর্তব্য

১. সংঘাতকে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে কীভাবে এর জন্ম হলো এবং কীভাবে তার নিষ্পত্তি হতে পারে।

২. নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট করতে হবে, জটিলতা ও সকল পক্ষের মতামত তুলে ধরা এবং ব্যক্তিগত আনুগত্য (যদি থাকে) পাঠক ও দর্শকদের কাছে পরিষ্কার করা।

৩. সংঘাতের পটভূমি ও কারণ সম্পর্কে রিপোর্ট করা, যাতে সকল পক্ষের যুক্তিসম্মত ও ধারণাজাত ক্ষোভের যথাযথ প্রতিফলন থাকবে, এবং পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, এমনকি কোনো পক্ষের ধারণাজাত ক্ষোভও (তা যুক্তিসঙ্গত না হলেও) সংঘাতকে জিইয়ে রাখা এবং সংঘাত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. মানবিক দিককে তুলে ধরতে হবে, সংঘাতের শিকার মানুষদের ক্ষত ও তাদের নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, পেশাগত মানসম্পন্ন মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ রিপোর্ট করতে হবে। সংঘাতের শিকার মানুষ এবং পাঠক-শ্রোতা-দর্শক উভয়ের প্রতিই এটি সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা।

৫. শান্তির উদ্যোগ নিয়ে রিপোর্ট করা।

৬. আমাদের নিজেদের প্রভাব সনাক্ত করা এবং কীভাবে আমাদের রিপোর্টিং একটি সংঘাত ও এর শিকার জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করবে তা চিহ্নিত করা।

দি ইন্সটিটিউট অব ওয়ার অ্যান্ড পিস রিপোর্টিং

সত্যের কাছে যাওয়া

জনগণের কাছে সৎ, যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য রিপোর্টিং করা গণমাধ্যমের একটি নৈতিক ও পেশাগত বাধ্যবাধকতা। এ ধরনের রিপোর্টিং তথ্যের বিকৃতি ঘটায়না বা তথ্যের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে না। এমন পরিস্থিতিও হয় যেখানে সাংবাদিকরা পূর্ণাঙ্গ তথ্য পান না। তবে এসব পরিস্থিতিতে কেন তথ্যের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার কারণগুলো উল্লেখ করা সাংবাদিকদের জন্য অপরিহার্য। সাংবাদিকতা এবং গণতন্ত্র যথাযথভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যাতে জনগণ সংবাদ মাধ্যমের ওপর আস্থা রাখতে পারে এবং জানতে পারে যে, তারা যা পড়ে, যা দেখে ও শোনে সবই সত্য, নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যপূর্ণ রিপোর্ট।

যখন কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তথ্যকে কাজে লাগানো হয় বা তথ্য সেন্সর হয় এবং নানা ধরণের 'সত্যের' মধ্যে মনোযোগ আকর্ষণের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে তখন যথার্থতা নিশ্চিত করাই সংঘাত রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য প্রধান সমস্যা। অশুদ্ধতা সাধারণত তখনই আসে যখন সাংবাদিকরা অনির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করেন। নিজ উদ্যোগে জনগণকে কর্মকাণ্ডের বিবরণ জানানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষই প্রায়শ সবচেয়ে নিকৃষ্ট আইন লঙ্ঘনকারী।

জরুরি অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে অনানুষ্ঠানিক নির্দেশনা জারির পর বাংলাদেশের গণমাধ্যম নেতৃবৃন্দ নতুন বিধি-নিষেধের ব্যাপারে তাদের অস্বস্তির বিষয়টি অবহিত করেন। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৃশ্যত একটি স্বাধীন গণমাধ্যমের উপযোগিতার বিষয়টি অনুধাবন করতে থাকে, কারণ স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায় সরকারের কাছে জনগণের অনুভূতি বোঝার আর কোনো উপায় ছিল না।

প্রশাসন গণমাধ্যমের সমর্থন এবং অনুমোদন লাভের ইচ্ছাও প্রকাশ করে। তারা দাবি করেছিল যে, একটি অধিকতর স্বচ্ছ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য এটি হবে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা। দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রতিও গণমাধ্যমের অনুমোদন কামনা করে সরকার।

তথাপি প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ এই ধারণাই দেয় যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার শর্তাধীন। ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল 'অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর সংবাদ' পরিবেশন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে সরকারের তথ্য অধিদপ্তর সকল সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশনে একটি চিঠি পাঠায়।

সতর্কতামূলক ঐ চিঠিতে দাবি করা হয় যে, 'কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যম অসৎ ও অপেশাদার রাজনৈতিক বিবৃতি, ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন, ফিচার ইত্যাদি প্রকাশ অথবা সম্প্রচার করছে, যার ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।' চিঠিতে আরো বলা হয়, 'কোনো কোনো সংবাদপত্র সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করছে।' 'জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর' উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে বলে ওই চিঠিতে দাবি করা হয়। কারো সম্পর্কে এ ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশন, অপপ্রচার বা অতিরঞ্জন যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে আরো সতর্ক হওয়ার জন্য সরকার সংবাদ মাধ্যমের প্রতি 'অনুরোধ' জানায়। উপদেশমূলক চিঠিটিতে আরো বলা হয়, 'সরকার আশা করে , দেশের গণমাধ্যম রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট নয় এমন এবং উল্লেখযোগ্য সংবাদ, ফিচার, আলোচনা, ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ বা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আরো বেশি যত্নবান হবে, যাতে করে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা বজায় থাকে।'

গণমাধ্যমের স্বাধীন ভূমিকার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে বরং গণমাধ্যমকে প্রশাসনের পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে সংশ্লিষ্ট করার একটা প্রয়াস প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লিখিত চিঠিতে আরো বলা হয়, 'সরকারের চলমান বহুমুখী সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এবং এই ইতিবাচক ভূমিকার জন্যই জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রশাসন সব সময় সক্রিয় ছিল।'

কী ধরণের শর্ত মানা হলে প্রশাসন একই রকম 'সহিষ্ণুতা' প্রদর্শন করবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ঐ সরকারি প্রজ্ঞাপনে দেশের গণমাধ্যমের প্রতি প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত বিষয়ের ব্যাপারে 'আরো বেশি যত্নবান' হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই শর্তে সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে 'সক্রিয় ভূমিকা' পালন করবে বলে ঐ প্রজ্ঞাপনে অঙ্গীকার করা হয়।

২০০৭ সালের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নতুন প্রশাসন প্রথমবারের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে তাদের অবস্থানে সূক্ষ্ম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তেই সরকার সংবাদ মাধ্যমের প্রতি 'আরো যত্নবান হয়ে এবং দায়িত্বশীলতার' সঙ্গে রিপোর্ট করতে নির্দেশ জারি করে। এর অব্যবহিত পরেই টেলিভিশন চ্যানেলের

বেশ কিছু টক শো এবং সংবাদ বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আরো একটি স্থগিতাদেশের পর মধ্য সেপ্টেম্বরে টিভি চ্যানেলগুলোকে টক শো প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। সিনিয়র মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারা যুক্তি দেখান যে, বন্যার মতো জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার অধিকার জনগণের রয়েছে। অনুমতি দেওয়া হলো। কিন্তু আবারো তা হলো শর্তসাপেক্ষ।

জরুরি অবস্থায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম কঠিন সময় অতিক্রম করেছে। তবে গণমাধ্যম যদি কিছু ন্যূনতম অধিকারের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতো তবে তাকে প্রশাসনের এরকম চাপের মুখোমুখি হতে হতো না। নূন্যতম অধিকারের ব্যাপারে এই যে সমঝোতা তাতে কিন্তু বেশ কিছু দায়বদ্ধতা মেনে নেওয়ার বিষয়ও জড়িত। এবং রাজনৈতিক সংঘাতপ্রবণ একটি সমাজে সংঘাত-সংবেদনশীলতার ব্যাপারে ঐকমত্যের অভাব হলে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে এ ধরনের সমঝোতার বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের তথ্যের উৎসর ব্যবহারের ওপর আইএফজে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলে এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩৩ শতাংশ) বলেছেন, তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে তারা পুলিশকে ব্যবহার করেছেন। ২৫ শতাংশের প্রাথমিক উৎস রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলো। মাত্র ৫ শতাংশ জানিয়েছেন, প্রাথমিক তথ্যের জন্য তারা বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) দ্বারস্থ হয়েছেন। এবং ৬.৬৬ শতাংশের তথ্যের উৎস ছিল সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন।

তবে এই সাংবাদিকরা তাদের এসব উৎসের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আস্থাবান ছিলেন না। ৬০ শতাংশের বেশি সাংবাদিক মনে করেন, সংঘাত ইস্যুতে তথ্য দপ্তর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী যেসব তথ্য সরবরাহ করে তা ছিল সীমিত। আর ৩৩.৬৬ শতাংশ বিশ্বাস করেন, ঐ সব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য 'পক্ষপাতদুষ্ট'।

তথ্যের উৎস সন্ধান

বাংলাদেশে আইএফজে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেঃ

- ৩৩.৩৩ শতাংশ সাংবাদিক তথ্যের প্রাথমিক উৎসব হিসেবে পুলিশকে ব্যবহার করেছেন।
- ২৫ শতাংশের প্রাথমিক উৎস রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলো।
- ৫ শতাংশের প্রাথমিক উৎস এনজিওগুলো।
- ৬.৬৬ শতাংশের তথ্যের উৎস হচ্ছে সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন।

তবে সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা তাদের এসব উৎসের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আস্থাবান নন-

- ৬১.৬৬ শতাংশ মনে করেন, সংঘাত সম্পর্কে তথ্য দপ্তর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সরবরাহ করা তথ্য ছিল সীমিত।

- ৩৬.৬৬ শতাংশ বিশ্বাস করেন, ঐ সব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছিল পক্ষপাতদুষ্ট।

ভাষার প্রতিবন্ধকতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলে এমন লোকদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার অসুবিধা যথাযথ রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ। বাংলাদেশে এটি কোনো মারাত্মক সমস্যা নয়। তবে একই ভাষাভাষীদের মধ্যেও বিশেষ কোনো শব্দ ব্যবহারের কারণে ভিন্নমতের সৃষ্টি হতে পারে।

রিপোর্টে পরবর্তীকালে ভুল তথ্য ধরা পড়লে প্রথম পদক্ষেপ হবে জনগণের আস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে একটি সংশোধনী প্রকাশ করা যা ভুলের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করবে।

নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য যা দরকার

- প্রত্যক্ষ সূত্র এবং পরোক্ষ সূত্রের মধ্যে পার্থক্য করা।

- সর্বদা নির্ভরযোগ্য উৎসের ব্যবহার করতে হবে, এবং সম্ভব হলে প্রত্যক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

- উৎসের ব্যাপক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে কোনো ইস্যু বা ঘটনার ক্ষেত্রে সেখান থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

- প্রান্তিক গোষ্ঠী অথবা উন্মুক্ত আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে এমন গোষ্ঠীর মধ্যে উৎসের সন্ধান করা।

- অপরাধ বিষয়ক রিপোর্টিং করার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির দিকটিও রিপোর্টে থাকা দরকার।

- সত্যতা যাচাই কঠিন হলে সেক্ষেত্রে নিহতের সংখ্যা উল্লেখ না করা।

- রিপোর্টে কোনো ভুল হলে তা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রেক্ষাপট

সংবাদে পটভূমি থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাংবাদিকদের এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, তার পরিবেশিত সংবাদ সীমা অতিক্রম করে মতামত দিতে পারবে না যাতে কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়। সংবাদে সকল পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপিত হবে। সকল পক্ষের সঙ্গে

যোগাযোগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সংবাদে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোনো ঘটনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া বা ভিত্তিহীন তথ্য যোগ করা মিথ্যাচারের সামিল। মিথ্যা রিপোর্টিং বিশেষ করে তা সংঘাত সম্পর্কে হলে জনগণের আস্থা বিনষ্ট হয় এবং তা জনজীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে।

প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে যাতে নজর দিতে হবে

- সংঘাতের ইতিহাস অনুসন্ধান করা।
- বিচ্ছিন্ন কোনো একটি সহিংসতার ঘটনার ওপর গুরুত্ব প্রদানের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা।
- সংঘাতের প্রতিটি পক্ষ কী হারাবে অথবা কী অর্জন করবে তা খতিয়ে দেখা।
- ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তা তুলে ধরা।

বস্তুনিষ্ঠতা

সংঘাত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের ওপর পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয় :

- প্রথম মতবাদ বলছে যে, সাংবাদিকদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র সংঘাতের রিপোর্ট করা, সংঘাতের সমাধান খোঁজা তার কাজ নয়। এ কাজটি অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
- দ্বিতীয় মতবাদে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, সাংবাদিকরা শুধুমাত্র সংঘাতের রিপোর্ট করেই ক্ষান্ত হবে না, তাদেরকে সংঘাতের নিষ্পত্তির উপায় সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

সাংবাদিকদের যেকোনো সমাবেশে এই দুই মতবাদের সমান সংখ্যক সমর্থক পাওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। এবং পেশাদার সাংবাদিকরা সংঘাত হ্রাসের উদ্যোগ নেন না -তা অস্বীকারের উপায় নেই। বরং সাংবাদিকরা নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেন।

'নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতার' বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এই যুক্তি দেখানো যায় যে, শুধুমাত্র সংঘাতের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে অথবা অন্য কথায়, একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে একজন সাংবাদিক বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। লোকে যখন দেখে যে গণমাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটছে তখন তারা একে একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে গণ্য করেন, যার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও সুস্থ আলোচনা পরিচালিত হতে পারে। বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতকে দমিয়ে রাখার পরিবর্তে সমাজের ভালো সবকিছু প্রকাশের ফোরাম হিসেবেই গণমাধ্যমকে গণ্য করা হয়। এই অর্থে, বস্তুনিষ্ঠত সাংবাদিকতা পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে আলোচনা শুরুর উপায়ে পরিণত হয়। এভাবে এটি সংঘাত নিষ্পত্তিতে অবদান রাখে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন দমননীতি বিরাজ করে তখন সাংবাদিকতা এই ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন বীজ ও সারের

১৪ দলীয় জোট আহুত দেশব্যাপী অবরোধ চলাকালে ঢাকার গুলিস্তান এলাকায় ছবি তুলতে গেলে পুলিশ এটিএন বাংলার ক্যামেরাম্যান আহসানুল কবির পিন্টুকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে এবং তার ক্যামেরা ভেঙ্গে দেয়। (২৮ অক্টোবর, ২০০৬, ঢাকা) ফটো: ফিরোজ আহমেদ/দৃকনিউজ

সরবরাহ সম্পর্কে সম্প্রতি রিপোর্ট করে গণমাধ্যম প্রশাসনের রোষানলে পড়ে। ২০০৭ সালের ১৩ নভেম্বর প্রশাসন এ অভিযোগ তোলে যে বপন মওসুমে সারের সরবরাহ সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'অপপ্রচার' চালাচ্ছে প্রচার মাধ্যম। কৃষকদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ বিভিন্ন সার বিতরণস্থলে বিক্ষুব্ধ রূপ নেয়। ধরে নেওয়া যায়, এই পরিস্থিতির রিপোর্ট করতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যম যথাযথভাবে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছিল। কিন্তু প্রশাসনের প্রতিক্রিয়ায় যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তা গণমাধ্যমের অভ্যন্তরে এক তীব্র নিরাপত্তাহীনতার বোধের জন্ম দেয়। এর ফলে গণমাধ্যমের মূল লক্ষ্য জনগণকে অব্যাহতভাবে অবহিত করে যাওয়ার কাজটি ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশে আইএফজের সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের অধিকাংশই (৮৮.৩৩ শতাংশ) বিশ্বাস করেন যে, সংঘাত কাভারেজের ক্ষেত্রে এখানকার গণমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট। এর প্রধান কারণ হিসেবে তারা মনে করেন- গণমাধ্যমের বাণিজ্যিক স্বার্থ (৫৬ শতাংশ) অথবা গণমাধ্যম মালিকদের রাজনৈতিক স্বার্থ (১৮.৩৩ শতাংশ)।

আরো সাধারণভাবে, ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, সাধারণত গণমাধ্যম কোনো ঘটনার সবদিক তুলে ধরে রিপোর্ট করে থাকে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা (১৫ শতাংশ) এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেননি। অর্ধেক সংখ্যক বলেছেন, তাদের রিপোর্ট ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। আর রিপোর্ট ভারসাম্যপূর্ণ

ছিল না বলে জানিয়েছেন ৭ শতাংশ। সকল উত্তরদাতাই দাবি করেন , তারা প্রতিবেদন এমনভাবে তৈরির চেষ্টা করেছেন যাকে বলা যেতে পারে বিশ্লেষণমূলক।

কোনো সমাজে সহিংস হুমকি থাকলে কখনও কখনও গণমাধ্যম কোনো পক্ষ নিয়ে থাকে। নেপালে সরকার মাওবাদী গেরিলাদের হামলার প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারি করলে সেদেশে এমনটি ঘটেছিল। প্রধান মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের এই পদক্ষেপের সঙ্গে একমত পোষণ করে এবং জরুরি ক্ষমতা যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে পদদলিত করেছে তা তারা উল্লেখ করেনি। গণমাধ্যম মাওবাদীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিহিত করার জন্য সাধারণভাবে সরকারের ব্যবহৃত ভাষাই ব্যবহার করেছে। নেপালের গণমাধ্যম খুব দ্রুত মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। এ অবস্থায় স্বাধীনভাবে রিপোর্ট করা এবং সকলপক্ষের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা সাংবাদিকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সাংবাদিকরা সেলফ-সেন্সরশিপ আরোপ করেন এবং তাদের নিরপেক্ষতা হারান।

ভারসাম্য নিশ্চিত করতে যা দরকার

- কোনো পক্ষের 'চিয়ারলিডার' হওয়া পরিহার করা।
- বিভিন্ন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে ও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।
- এসব মতামতের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা। কিছু মতামত কি সংখ্যা গরিষ্ঠেরই মতামত?
- অন্যের মতামতকে নিজের ভাষায় স্পষ্ট করে তুলে ধরার পরিবর্তে সম্ভব হলে তাদেরকে সরাসরি উদ্ধৃত করুন।
- নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, সংবাদ যেভাবে লেখা হয়েছে তা ধর্মীয় ও জাতিগত অনুভূতিকে আঘাত করবে বা উস্কে দেবে কিনা।
- 'মিথ্যা ভারসাম্য' সৃষ্টি না করা। ভারসাম্য মানে এই নয় যে, সকল পক্ষের বক্তব্যেই সমান যুক্তি আছে।
- মনে রাখবেন আপনি সমগ্র কমিউনিটির জন্য রিপোর্ট করছেন, শুধুমাত্র আপনার নিজের জাতিগত গোষ্ঠীর জন্য নয়।

ভাষা

সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে ভাষা, ছবি ও শব্দ– যা আমরা ব্যবহার করি। এসব হাতিয়ার ব্যবহার করে আমরা আতঙ্ক ও মিথের পরিবর্তে পরস্পরকে বোঝার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। ঘৃণা ও সংঘাতকে উস্কে দেয় এমন ভাষার ব্যবহার যেকোনো মূল্যে পরিহার করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী, এতে স্বাক্ষরদানকারীরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, 'জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রতি যেকোনো ধরনের সমর্থন যা বৈষম্য, বৈরিতা বা সহিংসতাকে উস্কে দেয় তাকে আইন প্রয়োগ করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

সাংবাদিকরা সাধারণত একমত যে, বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা তাদের উচিত নয়। দায়িত্বহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে জাতিগত সহিংসতা উস্কে দেওয়ার কাজে নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত নয় বলে তারা একমত। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন এমনভাবে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেন এবং কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করেন যা সংঘাতকে উস্কে দিতে পারে তখন এক উভয় সংকট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পেশাগত এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সকল সাংবাদিকের কাছেই একটি প্রাণবন্ত আলোচনার বিষয়। জনপ্রতিনিধিদের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য নিয়ে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, এক্ষেত্রে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনেকে বলেন, জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আবার অন্যদের যুক্তি হচ্ছে- বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে রিপোর্টিং হবে কি হবে না সেটা প্রশ্ন নয়, বরং কীভাবে রিপোর্ট করা হবে সেটাই প্রশ্ন।

কেনিয়ায় রেডিও অনুষ্ঠান জাতিগত সহিংসতা উস্কে দিয়েছিল

কেনিয়ায় মিডিয়া মনিটরিংয়ে নিয়োজিতরা জানিয়েছেন, স্থানীয় ভাষার রেডিও স্টেশনগুলো থেকে প্রচারিত উস্কানিমূলক বিবৃতি এবং সঙ্গীত দেশটিতে নির্বাচন-পরবর্তী জাতিগত সহিংসতা উস্কে দিয়েছিল। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের পর ঐ সহিংসতায় প্রায় ৯০০ মানুষ নিহত হয়। গৃহহীন হয় আরো ২ লাখ ৫৫ হাজার মানুষ ।

প্রচারিত ঐসব অনুষ্ঠানে জাতিগত টুটসিদের 'অমানুষ' আখ্যায়িত করে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটনে জাতিগত হুটুদের উস্কে দিয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত কেনিয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতে, কেনিয়ার স্থানীয় রেডিও স্টেশনগুলো থেকে প্রচারিত মতামতে অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠী সম্পর্কে নেতিবাচক ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাষা ও অস্পষ্ট সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই মানবাধিকার কমিশন ২০০৭-এর ২৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে সেদেশে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য মনিটর করে। যেমন, কালেনজিন-ভাষী একটি রেডিও স্টেশনে ফোন করে কিছু লোক বলেছে, গবাদিপশু পালনকারী কালেনজিনদের উচিত ঘাস কেটে রাখা। কেনীয় মানবাধিকার গ্রুপগুলোর মতে, জাতিগত কিকুয়ুদের রিফ্‌ট ভ্যালির ওই প্রদেশ থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে প্রদেশটির আদি অধিবাসী কালেনজিনদের প্রতি এই আহ্বান জানানো হয়। অন্য কিছু কালেনজিন রিফ্‌ট ভ্যালিতে বসবাসকারী জাতিগত কিকুয়ুদের 'বসতি স্থাপনকারী' এবং মুরগি চুরি করতে আসা বেজি হিসেবে অভিহিত করে।

অন্যদিকে, লুওভাষী একটি রেডিও স্টেশন একটি গান সম্প্রচার করেছিল যাতে কেনিয়ার জাতিগত কিকুয়ু প্রেসিডেন্ট মোওয়াই কিবাকি এবং তার কিকুয়ু প্রাধান্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভাকে 'বেবুনের নেতৃত্ব' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঐ স্টেশনটি ছিল জাতিগত লুও সম্প্রদায় থেকে আসা বিরোধীদলীয় নেতা রাইলা ওডিঙ্গার সমর্থক।

নির্বাচন কমিশন কিবাকি-কে বিজয়ী ঘোষণার দুই দিন পর ১ জানুয়ারি জাতিগত কালিনজিন ও লুও সম্প্রদায়ের বিক্ষুব্ধ জনতা কিকুয়ু সম্প্রদায়ের ৩০ জনেরও বেশি নারী ও শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করে। তার পর আরো কয়েকশ' কিকুয়ুকে হত্যা করা হয় এবং ওই সম্প্রদায়ের এক লাখের বেশি মানুষকে রিফ্‌ট ভ্যালি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়।

কেনিয়ার নির্বাচনী সংবাদ প্রচার মনিটর করার জন্য জাতিসংঘ নিয়োজিত কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ এর প্রধান সীজার হান্ডা বলেন, রেডিও স্টেশন থেকে কিকুয়ু বিরোধী প্রচারণার সঙ্গে সহিংসতার হিংস্রতার একটি যোগসূত্র রয়েছে।

হান্ডা বলেন, "যখন কেউ বলে, 'আমরা আমাদের সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে চাই। আমরা আমাদের মাঝে বসতি স্থাপনকারীদের চাই না'- তখন সে যা বলতে চায় তা হলো– এসব লোককে তাদের বহু বছরের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।"

দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট জোমো কেনিয়াত্তা কেনিয়ার সর্ববৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠী কিকুয়ুরই মানুষ। কেনিয়া ১৯৬৩ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর তিনি হাজার হাজার কিকুয়ুকে উর্বর রিফ্‌ট ভ্যালির খামারগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

দেশটির স্বাধীনতা-উত্তর তিনজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে দুইজনই জাতিগত কিকুয়ু। অন্য উপজাতীয়রা বলেছে, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভূমির মালিকানায় দশকের পর দশক ধরে কিকিয়ু আধিপত্যে তারা ক্ষুব্ধ। কিকুয়ুভাষী দুটি রেডিও স্টেশনের প্রচারিত গানের কথা উল্লেখ করে তারা ওই উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের অভিযোগ করেছে। কেনীয় মানবাধিকার কমিশন বলছে, তারা এই খবরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে গানটি স্পন্সর করেছে প্রেসিডেন্ট কিবাকির রাজনৈতিক দল।

আলিশা রিউ
নাইরোবি
ভয়েস অব আমেরিকা
৩০ জানুয়ারি, ২০০৮

সাংবাদিকদেরকে নিজেদের কাজের ব্যাপারে সংবেদনশীল ও সতর্ক হতে হয়। কিন্তু অতি সতর্কতাজনিত সেল্‌ফ-সেন্সরশিপ গুজবের বিস্তৃতিলাভে সাহায্য করতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সত্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের যথাযথ প্রেক্ষাপট ও পটভূমি তুলে ধরার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের মতামত অনুসন্ধান করা। রিপোর্টিংয়ে জনপ্রতিনিধিদের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতির প্রকাশ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখারই চেষ্টা করা উচিত, যাতে রিপোর্টটি ঐ বিষয়ের প্রতি সমর্থন বলে না মনে হয়।

ভাষার ব্যাপারে সাবধানতা

- বাংলাদেশে আইএফজে সমীক্ষার উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬.৬৬ শতাংশ বলেছেন, তারা তাদের ব্যবহৃত ভাষার ব্যাপারে সংবেদনশীল এবং বিশেষ ধরনের তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তারা কিছু শব্দ পরিহার করার চেষ্টা করেন। তবে উত্তরদাতাদের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন, তারা এমনটি করেন না।

- মোট ৩৫ শতাংশ স্বীকার করেছেন, তাদের রিপোর্টে আবেগের উপাদান থাকে। ১৭ শতাংশ এ বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখেছেন।

- ৫৩.৩৩ শতাংশ বলেছেন, সাধারণভাবে সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট চাঞ্চল্যকর। ২৩.৩৩ শতাংশ এ ব্যাপারে একমত নন।

- এছাড়া ৩০ শতাংশ মনে করেন, সাধারণভাবে সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট উস্কানিমূলক। ২১.৬৬ শতাংশ এ ব্যাপারে একমত হননি।

ওপরে উল্লেখিত সমীক্ষার উত্তরদাতাদের মন্তব্যের আলোকে বাংলাদেশে একই ঘটনার দু'টি প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ আপনার বিবেচনার জন্য নিচে দেওয়া হলো। এ দুটি রিপোর্টে ভাষার সতর্ক ব্যবহার কী মাত্রায় দেখা যায়? এখানে ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্দ কী আবেগ সৃষ্টিকারী? ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে তথ্যের উৎসকে উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে কি ভারসাম্য আছে? উভয় প্রতিবেদনে কি আগের তথ্য যোগ করে সমস্যার প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে? এ দু'টি প্রতিবেদনকে সংঘাত-সংবেদনশীল করতে আপনি কী করবেন?

রিপোর্ট-১	রিপোর্ট-২
ঢাকা : গার্মেন্টস শ্রমিকরা নগরীর মীরপুর এলাকায় সোমবার তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা অন্তত ৫টি গার্মেন্টস কারখানা এবং বেশ কিছু যানবাহনে ভাঙচুর চালায়। কয়েক হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও অন্য কয়েকটি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যাতে ১০ জন পুলিশসহ ৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। ৪ ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলাকালে মীরপুর এবং পার্শ্ববর্তী কচুক্ষেত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। মিরপুর-১০ এবং কচুক্ষেতের	ঢাকা : পুলিশের সঙ্গে কয়েক হাজার গার্মেন্টস শ্রমিকের তীব্র সংঘর্ষে গতকাল বিকালে রাজধানীর মীরপুর এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে ৫০ জন শ্রমিক ও ২০ জন পুলিশসহ ১শ'রও বেশি আহত হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়ে তা রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ৪০টি টিয়ারগ্যাস শেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে। এর জবাবে শ্রমিকরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। উত্তেজিত গার্মেন্টস শ্রমিকরা এ সময় তাণ্ডব চালায় এবং বেশ কয়েকটি কারখানায় হামলা চালায়। এতে জানালার কাচ এবং আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মীরপুর অভিমুখী এবং

মধ্যে ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এবিসি অ্যাপারেলস লিঃ-এর গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের পুরো বেতনের দাবিতে এবং বিনা নোটিশে শ্রমিকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ঘটনার প্রতিবাদে মধ্যাহ্নভোজের সময় কর্মবিরতি শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পর শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসে এবং বিকাল ৪টার দিকে তারা মীরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজের সামনে মীরপুর-কচুক্ষেত সড়ক অবরোধ করে।

এ সময় শ্রমিকদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে XYZ কারখানার শ্রমিকরা তাদের দুইজন সহকর্মীকে ঐ কারখানায় আটকে রাখার পর হত্যা করেছে। এতে উত্তেজিত শ্রমিকরা XYZ কারখানায় হামলা চালায় এবং তাতে ভাঙচুর চালাতে থাকে।

মীরপুর ও কাফরুল থানার বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং অ্যাকশনে নামে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তারা শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে।

বিভিন্ন কারখানার আরো অনেক শ্রমিক বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে পুরো এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় সংঘর্ষে ১০ পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়।

মিরপুর ও কাফরুল থানার ডিউটি অফিসাররা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা এলাকায় টহল দিচ্ছে।

মীরপুর থেকে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ঘরে ফেরা লোকজনকে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এবিসি গার্মেন্টসের শ্রমিকদের পুলিশ লাঠিপেটা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বেতন বৃদ্ধিসহ ৮ দফা দাবিতে এবিসির শ্রমিকরা মীরপুর ১৩ নম্বর সেকশনের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, একজন মহিলা শ্রমিকসহ তাদের দুই সহকর্মীকে XYZ কারখানার মালিকের ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনী কারখানার ভেতরেই পিটিয়ে হত্যা করেছে। ফ্যাক্টরির ভেতরে তাদের লাশ ফেলে রাখা হয়েছে। এই গুজব অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে তারা রাস্তায় এবিসি গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সহিংস বিক্ষোভে যোগ দেয়। তারা পুলিশ ও গার্মেন্টস কারখানার ওপর বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকটি কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঐ সময় পুলিশ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। রাত ৮টার দিকে শ্রমিকদের ৬ জন প্রতিনিধিসহ পুলিশ XYZ কারখানায় প্রবেশ করে সেখানে ২ জন শ্রমিককে সত্যি সত্যি হত্যা করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে। কোনো লাশ না পেয়ে পুলিশ ও ৬ শ্রমিক ভবন থেকে আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসে।

যা হোক, যে ৬ শ্রমিক কারখানায় ঢুকেছিল তারা মালিকেরই লোক ছিল বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকরা পুলিশের ওপর হামলা ও কারখানায় ভাঙচুর চালানো শুরু করে।

XYZ এর পরিচালক (অর্থ) ক্যাপ্টেন (অব.) এম নুরুল আজিম শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'একটি স্বার্থান্বেষী মহল শ্রমিকদের সহিংস হয়ে ওঠার জন্য উস্কানি দিয়েছে।'

অধ্যায় ৩

সবার মতামত শোনা
মিডিয়ার মনোযোগ পাওয়া নিশ্চিত করা

অনেক সময় এ বিপত্তিটি হয় যে, মিডিয়া খুব ছোট গণ্ডীবদ্ধ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের জন্য কাজ করে। মিডিয়া তখন সেসব শব্দই ব্যবহার করে যা শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠক শ্রোতা-দর্শকই বুঝতে সক্ষম। ওই সব শব্দ কেবল নির্দিষ্ট সেই গোষ্ঠীটির সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে।

১৪ কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশে মুদ্রিত সংবাদপত্র বেশি হলে ২০ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছায়। যারা বাদ পড়ে যান সংবাদপত্রে তাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তাদের স্বার্থ সংবাদে প্রতিফলিত হয় না। সক্রিয় ঘটক না হয়ে তারা হয়ে ওঠেন নিছক লেখার বিষয়বস্তু।

এদেশে টেলিভিশনের আওতা সে তুলনায় অনেক বেশি যদিও হাল্কা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেই এখনো এ মাধ্যমটির আগ্রহ বেশি। কিন্তু দেশের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তার কারণে টেলিভিশনের নাগালও সীমিত।

এসব কারণে রেডিওর সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা ঘটেছে। তা হলো ২০০৮ সালের মার্চ মাসে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কমিউনিটি রেডিও নীতিমালা ঘোষণা। এ ঘোষণার অল্পদিন পরই কমিউনিটি রেডিও (সিআর) সম্প্রচার শুরু করার জন্য আগ্রহপত্র জমা দেওয়ার আহ্বানও করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতার শর্তের দিক থেকে দেখলে বলতে হবে ঘোষিত নীতিমালা খুবই নমনীয়। যে ভাষায় একটি কমিউনিটি বা সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার আওতা বেশ

বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ তাদের অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার। (ঢাকা, ২২ জুন, ২০০৭)
ফটো: ফিরোজ আহমেদ/দৃকনিউজ

ব্যাপক: একটি জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (শহর, গ্রাম বা পাড়া) বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণন ও পণ্য ও সেবার বিনিময়ের মাধ্যমে যৌথ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাপনের মতো অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহের অধিকারী। ঘোষিত নীতিমালায় এরকম যে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কমিউনিটি রেডিওর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। একক ব্যক্তি, নিবন্ধিত কম্পানি, রাজনৈতিক দল, আন্তর্জাতিক সংগঠন (এনজিও বা অন্য যে কোনো) এবং বিদেশি প্রচারমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে না বলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথাগত বিধিনিষেধের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। যেমন: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর বিষয় প্রচার করা যাবে না। অন্য যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধগুলোর মধ্যে রয়েছে আদালত অবমাননা বা আক্রমণাত্মক কাজে উস্কানি দেওয়ার মতো বিষয়।

গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন একজন রিকসা চালক। ঘটনাটি ঘটে ঐস্থানে দায়িত্বরত ফটোসাংবাদিকের সামনেই। গোলাগুলির মত এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা প্রায়শই থাকেন গান পয়েন্টে, ফলে দুর্ঘটনার নজিরও রয়েছে। (মালিবাগ, ঢাকা ১৯৯০)
ফটো: আজিজুর রহীম পিউ/দৃকনিউজ

কিন্তু কমিউনিটি রেডিও শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করবে এবং ওই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বাইরে পদার্পণ করবে না- এ শর্ত নিয়ে কিছু উদ্বেগ রয়েছে।

সম্প্রচারের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু নেতিবাচক নির্দেশনার পাশাপাশি কি কি করা যাবে সে বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শও আছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের ভাষণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করে দেয় এমন অন্য আরো বিষয়বস্তু প্রচারের বিষয়।

সরকার অনেক সময়ই এটা ধরে নেয় যে, সীমিত সম্পদ (যেমন সম্প্রচার সরঞ্জাম) দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করবে এ ভরসা করে তা জনগণের কাছে ছেড়ে দেওয়া যায়না। বিশেষ করে সংঘাতপ্রবণ সমাজে এ উদ্বেগ বেশি থাকে। কিন্তু অনেক সময় জনগণকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দেওয়াই হতে পারে অন্যদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘাত এড়ানো বা সমাধানের সর্বোত্তম উপায়। অতিরিক্ত বিধিনিষেধ ও সুরক্ষার কড়াকড়িহীন একটি বিশ্বাসযোগ্য সিআর নীতিমালা জনগণের ক্ষমতায়ন এবং এর ধারাবাহিকতায় সংঘাত নিরসনেরও হাতিয়ার হতে পারে। জাতীয় এজেন্ডাকে প্রভাবিত করতে সমাজের বিভিন্ন পক্ষকে সহায়তা করতে পারে তা।

সমাজের বিভিন্ন মহলকে সম্প্রচার মাধ্যমে সরাসরি তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া ছাড়াও সাংবাদিকদের উচিত মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন 'সোর্স ' তৈরি করার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। ওই সব সোর্স সাধারণ মানুষের জীবনধারা, তাদের আশা-নিরাশা,সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সংবাদ বিজ্ঞপ্তির আশায় বার্তা কক্ষে বসে থাকলে ওই জীবনঘনিষ্ঠতার ছোঁয়া পাবেন না সাংবাদিকরা।

সংঘাত-সংবেদনীল সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংঘাতের অভিজ্ঞতার কাহিনী অনুসন্ধান করে তা প্রচার করতে হবে। সাংবাদিকদের মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কাজ করার মতো তহবিল ও উপকরণ বন্দোবস্ত করতে হবে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

ভালো প্রতিবেদকদের সাধারণত অনেক সোর্স থাকে যা তথ্যকে ভালোভাবে যাচাই করে নিতে সাহায্য করে। যেসব সাংবাদিক তাদের রিপোর্টে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কণ্ঠস্বর ধারণ করতে চান তাদের ওইসব মানুষের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্র গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে থাকবে চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশা ও স্তরের মানুষ। বিভিন্ন ধরণের ভাষাভঙ্গীতে কথা বলতে সক্ষম সোর্স গড়ে তোলাও খুব জরুরি।

প্রত্যক্ষ বা মূল সোর্স সবসময়ই অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয় সূত্র থেকে শোনা কথা বা অনুমানভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভর করলে ভূলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সোর্স: অনুসরণীয় বিধি

- সম্ভাব্য সোর্স বা সূত্রের একটি তালিকা করুন। সহকর্মীদেরও তা ব্যবহার করতে দিন। নিত্যদিনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সূত্র যোগ করুন তালিকায়।

- অন্য ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন যারা বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য যোগাতে পারবেন।

জাতিগত পরিচয়

গুণগত মানসম্পন্ন এবং সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি একটি বিষয় হলো: সংবাদ প্রতিবেদনে ভিন্ন ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় সম্পর্কে গৎবাঁধা মন্তব্য করা বা অনুমানভিত্তিক কথা বলা যাবে না। কখনোই কোনো বিশেষ বর্ণ বা জাতি নিয়ে নিন্দামূলক কিছু বলা যাবে না। এছাড়া জাতিগত পরিচয়, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে যেন অজ্ঞাতসারে অনুমানভিত্তিক তথ্য ব্যবহার না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জাতি,বর্ণ,ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয়ের তথ্য খবরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিনা সবসময় নিজেকে এ প্রশ্নটি করতে হবে সাংবাদিককে।

আইএফজে-র জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ সাংবাদিক জানিয়েছেন তারা অপরাধ বা সামাজিক বিরোধের খবর লিখতে গিয়ে সংখ্যালঘু বা জাতিগত গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিচয় উল্লেখ করেন। তবে প্রায় তিন-চতুর্থাংশই (৭৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ) বলেছেন, সাধারণভাবে মিডিয়া অনেক সময়ই কিছু জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রথাগত ধারণাকে বহাল রাখে। অধিকাংশ উত্তরদাতার ধারণা, বাংলাদেশের মিডিয়া সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত করে। অনেকেই মনে করেন, সংবাদে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতের বিষয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ ধারণা ৬১ দশমিক ৬৬ শতাংশের।

উত্তরদাতাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ) বলেছেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে জাতিগত বা ধর্মীয় সংঘাতের খবর পরিবেশনের একটি গাইডলাইন আছে। তবে এরকম কোনো গাইডলাইন নিজে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন ।

এ ধরণের গাইডলাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে সাংবাদিকদের একজন মানুষের বিভিন্ন পরিচয় থাকার বিষয়টি সবসময় খেয়াল রাখার তাগিদ দেওয়া। একজন মানুষ নিজেকে নারী বা পুরুষ, একটি পরিবারের সদস্য, একজন নাগরিক, কোনো একটি ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ বা একটি জাতিগত গোষ্ঠীর সদস্য-- একইসঙ্গে এ সবগুলো পরিচয়েই দেখতে পারে। নিজেদের জাতিগত পরিচয় তারা জনসমক্ষে কতখানি প্রকাশ করবে তা নির্ভর করে তার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্প্রীতি বা উত্তেজনার মাত্রার ওপর।

ঢাকার দৃক মিলনায়তনে আইএফজে ও দৃকনিউজ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালা শেষে অতিথিদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যম কর্মীরা।
ফটো: গাজী নাফিস আদনান/দৃকনিউজ

জাতিগত, ধর্মীয় বা বর্ণগত পরিচয় উল্লেখ কি করতেই হবে?

- ৮৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার ধারণা, বাংলাদেশের মিডিয়া সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত করে।

- ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাত সংক্রান্ত খবর প্রকাশকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে মত দিয়েছেন ৬১ দশমিক ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা। ৩৫ শতাংশ বলেছেন একে 'মাঝারি রকমের' গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাকিরা বলেছেন, খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয় এ বিষয়টিকে।

- ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ বলেছেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির ব্যাপারে একটি গাইডলাইন আছে। তবে খুব নগণ্যসংখ্যক সাংবাদিকই নিজে এটি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। ৬৫ শতাংশের বেশি বলেছেন, তাদের আদৌ কোনো গাইডলাইন নেই।

- ৮৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বলেছেন, সংঘাত বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা এ বিষয়ে আরো ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারতেন।

- মাত্র ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ বলেছেন, তারা অপরাধ, মাদক বা সামাজিক বিরোধের ঘটনার প্রতিবেদন তৈরিতে জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

- ৭৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা সাংবাদিকই বলেছেন, মিডিয়া অনেক সময়ই নির্দিষ্ট কিছু জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে গৎবাঁধা ধারণা পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করে।

জাতিগত পরিচয়ের ব্যাপারে যা যা মনে রাখা দরকার

- কোনো ব্যক্তির জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয় উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকুন।
- কারো জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচয় উল্লেখ করা খুব জরুরি হলে নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে তার সঙ্গে কথা বলে নিন।
- খবর প্রদানকারীদের (সোর্স) জিজ্ঞেস করুন তারা কিভাবে তাদের পরিচিতি বর্ণনা করতে চান।
- অন্য কোনো প্রচারমাধ্যম প্রতিষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়ভাবে জাতিগত কারণই ঘটনার জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করলেও আপনার দায়িত্ব শ্রোতা-দর্শক-পাঠককে ঘটনার মূল কারণ জানানো এবং এটা বোঝানো যে,এর সঙ্গে জাতিগত পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।
- নিজের পক্ষপাতের ব্যাপারে খেয়াল রাখুন এবং খবর তৈরি ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।

লৈঙ্গিক সতর্কতা

সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে নারী ও নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খবর পরিবেশন করে নারীর প্রতি সমাজের আচরণের ওপর তার একটি বিশাল প্রভাব রয়েছে। সংঘাতের পরিস্থিতিতে খবরকে নাটকীয় করে তোলার জন্য মিডিয়া প্রায়শই বিপর্যস্ত নারীর বর্ণনা ও চিত্র তুলে ধরে যারা ঘটনার শিকার মাত্র। নারী প্রকৃতপক্ষেই সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার হতে পারে বটে, কিন্তু এধরণের গৎবাঁধা চিত্রায়ন নারীকে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম শক্তি হিসেবে না দেখে তার গতানুগতিক মা ও স্ত্রীর ভূমিকাকেই কেবল তুলে ধরে।

শিশু

সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়। বয়স্ক মানুষ এবং সরকারকে অবশ্যই তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। ঘরের অশান্তি, রাস্তাঘাটে দিনকাটানো ছিন্নমূল শিশুদের ওপর অন্যায় হামলা বা সর্বাত্মক যুদ্ধ-- পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শিশুদের যথাসম্ভব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবাদিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। সমাজের আর সবার মতো শিশুদেরও কোনো একটি সংঘাত সম্পর্কে তাদের অভিমত, এর কারণ ও সমাধান বিষয়ে নিজেদের কথা তুলে ধরার অধিকার আছে।

আইএফজে-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা শিশুদের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। শিশুদের অভিমতও বিবেচনায় নেওয়ার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন তারা। অভিমত দিতে গিয়ে শিশুরা যেন ব্যবহৃত না হয় কিংবা সুযোগসন্ধানী লোকের পাল্লায় পরে আরো বিপন্ন না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখবেন তারা।

দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনায় জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ। সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাঁটাইয়ের কারণে সংবাদ কর্মীরা খন্ডকালীন বেকারত্বের কবলে পড়েন প্রায়শই। (ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর,২০০৭)
ফটো: ফিরোজ আহমেদ/দৃকনিউজ

বার্তাকক্ষে বৈচিত্র্য

প্রচারমাধ্যমের ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিকদের উচিত তাদের চাকরির বিভিন্ন দিক, প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত কৌশলগুলো মাঝেমাঝে খতিয়ে দেখা। কিভাবে আরো উন্নতি এবং সাফল্য-ব্যর্থতার পরিমাপ করা যায় তা বের করার জন্য এটা তাদের দায়িত্ব। বার্তাকক্ষে বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রথম করণীয় হচ্ছে এর যে প্রয়োজন আছে সে কথাটা স্বীকার করা। বাংলাদেশে আইএফজে জরিপের উত্তরদাতা সাংবাদিকদের প্রায় সবাই (৯৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ) বলেছেন, তাদের নিজ নিজ বার্তাকক্ষের সহকর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়ের মানুষ রয়েছে।

সদস্যদের জাতিগত পরিচয়ের দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি কর্মীদল, জাতিগত দ্বন্দ্বের বিষয়টি মোকাবেলার উপায় তুলে ধরে এমন একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সম্পাদকীয় কাজের মান যাচাই ও তত্ত্বাবধান করার সদিচ্ছা-- এই তিনটি বিষয় সাংবাদিকদের জানা ও বোঝার পরিধিটিকে বড় করে অজ্ঞানতা ও অদক্ষতাজনিত ভুলের সংখ্যা হ্রাস করবে।

ব্যাপক পরিসরে বলতে গেলে, বার্তা বিভাগে মতামতের বৈচিত্র্য কামনা করে এমন একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের উচিত সমাজে মতামতের বৈচিত্র্যের ওপর সংবাদ পরিবেশনের দিকে জোর দেওয়া। এটি সংঘাতের সময় আরো বেশি ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনে সহায়তা করবে।

খবরের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য

মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকদের উচিত তারা কতখানি বৈচিত্র্য গ্রহণ করবেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতিফলন ঘটাবেন সেটা স্থির করা। এর জন্য একটি সুচিন্তিত ও সতর্ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। শুধু নবীন সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ নয়, বিদ্যমান আচরণবিধি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করাও চাই।

সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় বাইরের সমালোচনার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে এক হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের এসব বিষয় খোলামেলাভাবে আলোচনা করার সুযোগ দিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শক্তিশালী নেতৃত্ব আর অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। বিষয়টি একবার তোলা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কর্মস্থলে বৈচিত্র্য সাংবাদিকের সক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে হুমকিগ্রস্ত করে তো না-ই বরং তার দক্ষতাকে আরো শানিত করে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ প্রশ্নটি তুলতে হবে যে, সমাজের কোন কোন অংশ (যদি থেকে থাকে) ওই মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অবহেলিত হচ্ছে।

যেসব সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবে অবহেলিত বা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে প্রচারমাধ্যমের ওপর তাদের আস্থা কমে যেতে পারে। তারা হয়তো শুধুমাত্র যখন খারাপ কিছু ঘটে তখনই সাংবাদিক দেখে অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম সাংবাদিকদের তারা স্বাগত না-ও জানাতে পারে। ওই সম্প্রদায়ের কারো সঙ্গে যোগাযোগের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সাংবাদিকদের তাদের কিছু লোকের সঙ্গে সখ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হতে পারে। এ জন্য পারস্পরিক আস্থা দরকার।

তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ

সূর্যের আলোর মতো জীবাণুনাশক আর নেই। প্রায়ই বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা। তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার বিশ্বব্যাপী জনগণের ক্ষমতায়নের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনগুরুত্বপূর্ণ ইসু বিষয়ে তথ্য হাতে পেলে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশীদারিত্ব যে কোনো সময়ের চেয়ে বেড়ে যায়।

সংঘাতের পরিস্থিতিতে জনগণকে অনেক সময় তথ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর কারণ, সরকার এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তথ্যের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে চায়। যে তথ্য অধিকার আইনে ন্যূনতম ব্যতিক্রম ছাড়া সব কিছু জনসমক্ষে প্রকাশ করার সুযোগ আছে সাধারণভাবে বলা যায় সেটাই সবচেয়ে ভালো আইন। এ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৈরি প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ একটি শুভ উদ্যোগ। এটা এখনো আইনে পরিণত হয়নি। তবে অধ্যাদেশ যে কোনো সময় জারি করা যেতে পারে

এবং কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে তা বিদ্যমান অফিসিয়াল সিক্রেসি আইনের সব ধারার বদলে এটিই প্রযোজ্য হবে।

সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো এ প্রস্তাবিত আইনটি নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ঘাটতি পেয়েছে। সবচেয়ে চোখে পড়ে যে ত্রুটিটি তা হচ্ছে বিপুলসংখ্যক ব্যতিক্রম যেসব ক্ষেত্রে কিনা কর্তৃপক্ষ জনগণকে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। অধ্যাদেশের ৮ নম্বর ধারায় যেসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যাবে এরকম নয়টি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এগুলোতে খুব মোটাদাগে কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন, "রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা, (অথবা) পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিষয়"; এর 'প্রতিরক্ষা' বা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি। যে তথ্য প্রকাশ করলে 'সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা' ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠন লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা-ও গোপন রাখা যাবে। ব্যক্তি বা সংস্থার খেলাপি কর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এবং সুদের হারও বিদ্যমান গোপনীয়তা আইনের বলে গোপন রাখা যাবে। বিধিনিষেধের তালিকা সুসম্পন্ন হয়েছে এমন একটি ধারা দিয়ে যার আওতায় দৃশ্যত সবকিছুকেই ফেলা যায়। এটি হচ্ছে জনস্বার্থ। সরকার যে তথ্য প্রকাশকে 'জনস্বার্থের পরিপন্থী' মনে করবে সে তথ্য গোপন রাখতে পারবে।

ব্যতিক্রমের অনেকগুলো ক্ষেত্রই সুনির্দিষ্ট নয় বলে সাংবাদিকরা উদ্বিগ্ন। তবে অন্তত এটা দেখে তারা একটু আশ্বস্ত বোধ করছেন যে শেষ পর্যন্ত তথ্যের অধিকার নিয়ে সমাজে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে একটি আন্দোলনের সূচনা হলে তা সাধারণত পরস্পরবিরোধিতায় লিপ্ত গোষ্ঠীগুলোকে সবার জন্য ভালো একটি আইনের অভিন্ন লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আর এরকম একটি আইন তৈরি হয়ে গেলে তা সমাজে সংঘাত নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

যাচাই করে দেখার বিষয়

সম্পাদকদের জন্য প্রশ্ন

- অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া ও খবরের পর্যায়ক্রম স্থির করার ক্ষেত্রে আমি বৈচিত্র্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি কি ?
- আমি কি বিভিন্ন ধরণের সোর্স ও খবরের অনুসন্ধান করতে প্রতিবেদককে যথেষ্ট সময় দিচ্ছি?
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ ও সূত্র গড়ে তুলতে আমি নিজে কি অফিসের বাইরে যাই?

প্রতিবেদকদের জন্য প্রশ্ন

- আমি যেসব সংগঠনের খবর কাভার করি তাদের কার্যকলাপ আমাদের সমাজের বিভিন্ন গ্রুপকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা কি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি ?
- একটি সংগঠনের কার্যকলাপের দ্বারা সমাজের কারো প্রভাবিত হওয়ার ঘটনার খবর কি আমি অনুসন্ধান করি?

- খবরের নতুন নতুন ধারণা ও দৃষ্টিকোণ পেতে সাহায্য করে এরকম মানুষ, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের আওতা কিভাবে বাড়ানো যায়?

- কীভাবে আমি আমার নিজের চেনাজানা মানুষ ও সোর্সের সংখ্যা বাড়াতে পারি?

প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রশ্ন

- আমি কি এই প্রতিবেদনটির জন্য বিভিন্ন ধরণের সূত্রের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করেছি?

- কোনো পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে খবরে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় ঢিলেমি দিয়েছি কি ?

- আমি কি 'টোকেন' পদ্ধতি ব্যবহার করছি যাতে একটি সম্প্রদায়ের কেবল একজনেরই কথা শোনা হয়? না, কণ্ঠস্বরের সত্যিকারের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছি?

- বৈচিত্র্য খুঁজতে গিয়ে আমি কি আসলে গৎবাঁধা ধারনাই বদ্ধমূল করছি, না তার বিরুদ্ধে লড়ছি?

- আমি কি যা দেখতে পাচ্ছি সেই সত্যিই তুলে ধরছি?

- প্রতিবেদনটি প্রকাশের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি ? কে এতে ক্ষতিগ্রস্ত আর কে-ই বা উপকৃত হবে?

- আমার সিদ্ধান্তকে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে স্পষ্ট করে এবং সততার সাথে তা ব্যাখ্যা করতে পারবো কি?

(যুক্তরাষ্ট্রের দি সিয়াটল টাইমসের প্রতিবেদক ও সম্পাদকদের জন্য তৈরি 'বৈচিত্র্য যাচাই তালিকা' থেকে নেওয়া।)

অনুসরণীয় সতর্কতা

সাম্প্রতিক খবরগুলোকে লিঙ্গ, বয়স ও জাতিগত পরিচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য সম্পাদনা বিভাগের নিয়মিত বৈঠক করুন।

ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত পরিচয় ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত খবরগুলো কিভাবে দেখা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলুন।

এ ইসুগুলোর কোনো একটি 'সমস্যা' হিসেবে উঠে এলে তা কত সময় পর পর হয়েছে ?
আপনার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদন কি এ বিষয়ে গৎবাঁধা ধারণাকে জোরদার করে?
পুলিশের কাছে অপরাধের খবর জানতে সপ্তাহে যতবার ফোন করা হয় তার সঙ্গে সাংবাদিকরা কতবার এলাকায় সরেজমিন তদন্তে যান তার সংখ্যার তুলনা করুন।
বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং প্রতিবেদকদের সেখানে যেতে উৎসাহিত করুন।

একটি নির্বাচিত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে পরামর্শক গ্রুপ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করুন। জনসম্প্রদায়ের কোনো একজন নেতাকে নিয়মিত অতিথি বক্তা হিসেবে আসার আমন্ত্রণ জানান। আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করুন। এগুলোতে কি সামাজিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়? প্রতিবেদক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছে অথবা প্রতিবেদনে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা করুন। মিডিয়ায় তাদের চিত্রায়নে কি বৃহত্তর সমাজের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটেছে?

প্রান্তিক ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার যোগাযোগ বাড়ান।
প্রতিবেদকদের বলুন তাদের পরিচিত সূত্র সবাই মিলে ব্যবহার করার জন্য তা একত্র করতে।
সূত্রের আওতা আরো বাড়াতে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতে বলুন তাদের।

অধ্যায় ৪

নৈতিকতা সচেতন সাংবাদিকতা হবে সংঘাত-সংবেদনশীল

সাংবাদিকদের প্রতিদিনই নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সংঘাতের সময় পরিস্থিতিটা সাধারণত অস্পষ্ট থাকে যেখানে বিভিন্ন পক্ষ নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জোর চেষ্টা চালায়। সাংবাদিকদের নৈতিকতার বিধিমালা এবং পেশাগত আচরণবিধি যে সুরক্ষাটি দেয় তা সংঘাত-সংবেদনশীল মানসম্মত সাংবাদিকতার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এই সাংবাদিকতা সংঘাতে উস্কানি সৃষ্টির ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক এবং সমাধান খোঁজার ব্যাপারে সচেতন থাকে।

সাংবাদিকদের প্রয়োজন একটি গাইডলাইন

কারণ তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন।

সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ভেতর বা বাইরে থেকে চাপ বা প্রভাব এড়ানোর জন্য বার্তাকক্ষ এবং সম্প্রদায় উভয়ের কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা নৈতিকতাজনিত সমস্যা ও উভয় সঙ্কটের মতো পরিস্থিতি সমাধানে সহায়তা করার জন্য ভালো গাইডলাইন বলতে স্রেফ কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তার একটি তালিকা বোঝায় না। বরং এটি হবে নৈতিকতার বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি দিকনির্দেশনা যার সাহায্যে সাংবাদিকেরা বিশেষ করে সংঘাত নিয়ে কাজ করার সময় তাদের সামনে উঠে আসা বিষয়গুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারেন।

একটি গাইডলাইন থাকলে সাংবাদিকরা তার ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের অসাধু ব্যবহারও ঠেকাতে পারেন। সম্পাদনার সময় কোনো ধরণের তথ্যবিকৃতি যাতে না ঘটে তা-ও নিশ্চিত করা সম্ভব এর মাধ্যমে।

যেমন, একটি প্রতিবেদন এমনভাবে সম্পাদনা ও উপস্থাপন করা হলো যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের আপত্তি আছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের জন্য সম্পাদকসহ বার্তাকক্ষের অন্যদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলার সুযোগ থাকতে হবে। কোনো একটি খবরের ইতিবাচক দিককে ছাপিয়ে নেতিবাচক দিকটির ওপর জোর দেওয়ার জন্য খবরের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করলেও এরকম হতে পারে।

সাংবাদিকরা কিভাবে কাজ করেন গাইডলাইন সে ব্যাপারে জনগণকেও সচেতন করতে পারে। একজন সাংবাদিক পাঠকসমাজকে তার নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য গাইডলাইনকে তুলে ধরতে পারেন। এ গাইডলাইনটি জনসমক্ষে প্রকাশ করার মাধ্যমে সাংবাদিকরা তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারেও সংঘাত হ্রাসে সহায়তা করেন।

যেসব সাংবাদিক পেশাগত মানের ব্যাপারে সচেতন তাদের উচিত সহকর্মীদের সাংবাদিকতার স্বীকৃত আচরণবিধি, অনুসরণীয় নীতি আর অন্যসব আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি মেনে কাজ করতে উৎসাহিত করা। সেই সঙ্গে যাদের কার্যকলাপ সৎ সাংবাদিকতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তাদের উৎসাহ যোগাতে হবে।

এ হ্যান্ডবুকের পাঠকদের এখন বলবো বাংলাদেশে সংঘাতের মূল বৈশিষ্টগুলোর দিকে নজর দিতে। এর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা অথবা দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে সমস্যা। মিডিয়ায় কি

তাদের কথা শোনা যায়? উদাহরণ হিসেবে এ গ্রন্থে দেওয়া (প্রবন্ধ ২) দেশের অন্যতম প্রধান ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়ুন। এটি কি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিস্থিতির সঠিক চিত্রায়ন? সাধারণত আপনি প্রচারমাধ্যমে এরকম কতগুলি প্রতিবেদন দেখে থাকেন?

সংঘাত বিষয়ক প্রতিবেদনের গাইডলাইন

সংঘাত-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিক এবং পয়েন্টার ইন্সটিটিউটের তৈরি নিচের এই গাইডলাইনটি মোটামুটি একটি ধারণার জন্য দেওয়া হচ্ছে। এটি চূড়ান্ত কিছু নয়।

ঘটনার নির্ভুলতা

বিভিন্ন ধরণের নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যবহার এবং সরাসরি ও পরোক্ষভাবে পাওয়া তথ্যের পার্থক্য যাচাই করে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করুন। বিভিন্ন ভাষাভাষী সাংবাদিক নিয়োগ করে বার্তাকক্ষে বৈচিত্র্য আনা গেলে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। এর মাধ্যমে ব্যবহৃত সূত্রের আওতাও বাড়ানো যায়। নির্ভুলতার জন্য সাংবাদিকরা অবশ্যই তাদের তথ্য যাচাই করে নেবেন। যে সূত্র থেকেই আসুক না কেন, কোনো বক্তব্যকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করা যাবে না কারণ, এমনকি 'আনুষ্ঠানিক' সূত্র থেকেও ভুল তথ্য মিলতে পারে। কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে দ্রুত তা স্বীকার করুন এবং এজন্য কারো কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা হয়ে থাকলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করুন।

ভারসাম্য

সংঘাত পরিস্থিতি কখনোই অপরিবর্তনীয় শেষ কথা হয় না। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত যাচাই করুন এবং ঘটনার বর্ণনায় সবার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থান দিন। সংবাদে নানাধরণের মতামতের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থাকলে শ্রোতাদর্শকের পক্ষে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তাদের মধ্যে এ বোধ হবে না যে, আগে থেকে তৈরি করা তথ্য গছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মূলধারার মিডিয়ার মধ্যে কিন্তু নারী, উদ্বাস্তু, প্রবীণ ও শিশুদের ব্যাপার উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা আছে। বিষয়টি স্বীকার করে পরিস্থিতি বদলের চেষ্টা করুন। সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক লাইন ও অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তের মধ্যে সীমিত না থেকে এর বাইরে নজর দেওয়াটা খুব জরুরি। খবরে ঘটনার মানবিক দিকগুলো তুলে ধরলে তা কেবল শ্রোতাদের মনোযোগই কাড়বে না, নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় না থেকে তাকে কোনো একটি ইস্যুতে জড়িত হতেও অনুপ্রাণিত করতে পারে তা।

সংবেদনশীলতা

অপ্রয়োজনীয়ভাবে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায়গত পরিচয় উল্লেখ করলে অনেকে আহত হতে পারেন এবং তা ভ্রান্ত অনুমানের জন্ম দিতে পারে। একইভাবে আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ শব্দ বা শব্দবন্ধ কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে নেতিবাচক মনে হতে পারে। এটা এড়ানোর বেশ কয়েকটি উপায় আছে। প্রথমত, আপনার নিজের কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকলে সেটি মাথায় রাখা। দ্বিতীয়ত, যা ছাপা হচ্ছে তাতে লোকের প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটা মাথায় রাখা এবং এরই ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদনে কী লিখবেন বা কী কী রাখবেন সেটা ঠিক করা। তৃতীয়ত, কিছু খুঁটিনাটি বিষয় কথায় বলতে গেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে বা কেউ আহত হলে সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে লেখার বদলে ছবি ব্যবহার করুন।

প্রেক্ষাপট

কোনো ঘটনাকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করলে পাঠকরা বর্তমান পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝতে পারে। প্রেক্ষাপট ছাড়া দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণ এবং তার সমাধান, পরিবর্তন বা সংস্কারের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কোনো ঘটনাকে তার সঠিক প্রেক্ষাপটে বিচার করার সময় সংশ্লিষ্ট মানুষদের অভিজ্ঞতাও যাচাই করতে হয়। তৃতীয় পক্ষের দ্বারস্থ বা অনুমাননির্ভর না হয়ে ওইসব মানুষকে সরাসরি জিজ্ঞেস করুন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের অনুভূতি কী বা তারা এর মাধ্যমে কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সংঘাত-সচেতন সাংবাদিকতা প্রেক্ষাপটের ওপর খুব জোর দেয় কারণ, এ ধরণের তথ্য ও জ্ঞান ভাগাভাগি করা হলে তা শ্রোতা-দর্শকদের কোনো একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে এবং সংঘাত সমাধানে অংশ নিতে সাহায্য করে।

দায়িত্বশীলতা

ভালোরকম যত্ন এবং দায়িত্ববোধের অভাব থাকলে সংঘাতবিষয়ক রিপোর্টিং উল্টো বিদ্যমান উত্তেজনা বৃদ্ধি করেও বসতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার পথ খুলে যেতে পারে। এটা স্পট যে, সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকের তরফে অনেক যত্ন ও দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন। কিছু বিশেষ বিবৃতি, ছবি, খবরের বিষয়বস্তু ও শিরোনাম বিশেষ করে সংখ্যালঘু বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখতে হবে। বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে মিডিয়ার একটি দায়িত্ব আছে যা কিনা সামাজিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে।

সাংবাদিকদের আচরণবিধি সম্পর্কে আইএফজে-র নীতিমালা

সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার, বিতরণ এবং খবর ও তথ্যের ওপর মন্তব্য করার কাজে সাংবাদিকদের জন্য প্রমিত আচরণবিধি হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে এই 'আন্তর্জাতিক ঘোষণা'।

১. সত্যের প্রতি এবং সত্য জানার ব্যাপারে জনগণের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাংবাদিকের প্রথম কর্তব্য।

২. এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক সবসময় সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতিকে রক্ষা করবেন। নায্য মন্তব্য ও সমালোচনার অধিকারও সমুন্নত রাখতে হবে তাকে।

৩. নিজে যেসব তথ্যের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত সাংবাদিক শুধু তার ভিত্তিতেই খবর পরিবেশন করবেন । তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধামাচাপা দেবেন না বা কাগজপত্র জাল করবেন না।

৪. সাংবাদিক প্রয়োজনীয় খবর, ছবি ও দলিলপত্র সংগ্রহে অসাধু উপায়ের আশ্রয় নেবেন না।

৫. কোনো ক্ষতিকর ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়ে গেলে সাংবাদিক তা সংশোধনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

৬. সাংবাদিককে আস্থায় নিয়ে দেওয়া তথ্যের উৎস সম্পর্কে তিনি পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

৭. বৈষম্যের মাত্রাকে মিডিয়ার আরো বাড়িয়ে দেওয়ার যে ঝুঁকি আছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সাংবাদিককে। জাতি, ধর্ম, লৈঙ্গিক পরিচয়, যৌনাচারের ধরণ, ভাষা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতামত এবং জাতীয় বা সামাজিক পরিচয়গত বৈষম্যে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে তাকে।

৮. অন্যের কাজ নকল করা, বিদ্বেষজনিত অসত্য বিবরণ, কুৎসা, মানহানি, মিথ্যা অপবাদ, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং খবর ছাপা বা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যে কোনোভাবে (টাকা, দ্রব্য বা সুবিধা) ঘুষগ্রহণ ইত্যাদিকে গুরুতর পেশাগত অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করবেন।

৯. যারা নিজেদের সাংবাদিক নামের যোগ্য বলে মনে করেন তারা উপরোল্লিখিত নীতিমালা বিশ্বস্তভাবে পালন করা কর্তব্য বলে মনে করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় থেকে পেশাগত বিষয়ে সাংবাদিক কেবলমাত্র তার সহকর্মীদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করবেন এবং সরকার বা অন্য কোনো মহলের হস্তক্ষেপ বরদাশত করবেন না।

(আইএফজে-র ১৯৫৪ সালের বিশ্ব কংগ্রেসে গৃহীত
১৯৮৬ সালের বিশ্ব কংগ্রেসে সংশোধিত)

চট্টগ্রাম ক্রিকেট মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের কথাকাটির এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের ওপর বেধড়ক লাঠি চার্জ করে পুলিশ।
ফটো: রাজেশ চক্রবর্তী/দৃকনিউজ

প্রবন্ধ ১

অঙ্গীকার আর অসঙ্গতি

আবুল মোমেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল। ভারত বিভাগের অল্পদিন পরই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও দেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা বা বুদ্ধিজীবী মহল এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘুর উপস্থিতির ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিংবদন্তীপ্রতিম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কার্যত একাই লড়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মূলধারার রাজনৈতিক নেতারা পার্বত্য এলাকার মানুষের দুঃখ ও বেদনার কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার সময় সমর্থনদানে অস্বীকৃতি জানালেন হতাশ মানবেন্দ্র লারমা। তিনি বলেছিলেন : এই সংবিধান বাংলাদেশে অন্য কোনো জাতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো উল্লেখ নেই।..আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবন অভিশপ্তই রয়ে গেছে।

১৯৭৪ সালের ২৩ জানুয়ারি পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে একটি "এক সংস্কৃতি ও এক ভাষার জাতি রাষ্ট্র" হিসেবে ঘোষণা করলে মানবেন্দ্র লারমা সংসদে দেওয়া ভাষণে আরো একবার তার জনগোষ্ঠীর উদ্বেগটি প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, "আমাদের প্রধান উদ্বেগ হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি বিলুপ্তির হুমকির মুখে। আমরা স্বকীয় পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাই।"

কিন্তু দেশের একটি অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নেতার ওই উদ্বেগ ও হতাশা সরকারের ওপর মহলের কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি।

স্বাধীনতাযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তুঙ্গ জাতীয়তাবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে সার্বিকভাবে সিভিল সোসাইটিও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর উদ্বেগের বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন তো বটেই, বস্তুত তেমন করে লক্ষ্যই করলেন না। এমনকি প্রচারমাধ্যমও পার্বত্য এলাকার মানুষের উত্থাপিত উদ্বেগের বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ সাড়া দিতে ব্যর্থ হলো।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা উন্নয়নের নামে সেখানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী যেসব হস্তক্ষেপ করেছি তার পরিণতি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা অস্বীকার করতে পারি না। বাঙালিরা পার্বত্য এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও মনোভাব বোঝার ক্ষেত্রে আবারো সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিলো। কাপ্তাই বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলো এই নিস্পৃহতা। পার্বত্য এলাকার মানুষ এসব প্রকল্পকে তাদের আত্মপরিচয় ও জীবনযাত্রার ওপর এক বড় ধরণের আঘাত বলেই মনে করেছে।

কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ

ও পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌচলাচল সুবিধা বাড়ানোর মতো বিভিন্ন উপায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এর সব উপযোগিতাই পুরোপুরি বাঙালিদের পক্ষে গেছে। কারণ, পাহাড়ী জনগণকে যেমন আস্থায় নেওয়া হয়নি তেমনি রাতারাতি নিজেদের জীবনধারা বদল করে ওইসব সুবিধা নিতেও চায়নি তারা। উপকার করার বদলে কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য এলাকার মানুষের ওপর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কাপ্তাই বাঁধ প্রায় ৪শ' বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন করেছে যার মধ্যে ছিল ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য জমি। এটি গোটা জেলার মোট চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশ। জলমগ্ন এলাকার মধ্যে ছিল মূল্যবান উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্রসম্পন্ন ১০ বর্গমাইল সংরক্ষিত বন এবং চাকমা রাজবাড়িসহ গোটা রাঙামাটি শহর।

কাপ্তাই লেক নামে পর্যটক আকর্ষণের স্থান হিসেবে সুপরিচিত সেই কৃত্রিম হ্রদ প্রায় ১৮ হাজার কৃষিজীবী চাকমা পরিবারকে নিঃস্ব করেছে। এ পরিবারগুলোর মোট সদস্যসংখ্যা এক লাখের বেশি। শুধু বেঁচে থাকার জন্য দিনমজুরির মতো কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

প্রায় ৬০ হাজার চাকমা সীমান্ত অতিক্রম করে যাদের বেশিরভাগই কয়েকটি পার্শ্ববর্তী ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে আশ্রয় নেয়। বাকিরা যায় মিয়ানমারে। পার্বত্য এলাকার মানুষের এই দুর্ভোগ প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কিংবা তাদের অত্যুৎসাহী এলিট শ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। এরা উভয়েই তখন পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে রত। কিন্তু স্বাধীনতালাভের প্রায় চার দশক পরেও আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারি এবং নাগরিক উভয় তরফের উপেক্ষা এবং অবহেলা মূলধারার জাতীয় চেতনা থেকে পাহাড়ীদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে আরো পোক্ত করেছে।

সমতলে বসবাসকারী জাতিগত সংখ্যালঘুদের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থা একইরকম, হয়তোবা আরো খারাপ। এ দেশে যে বেশকিছু জাতিগত সংখ্যালঘু রয়েছে সে ব্যাপারে আমরা সচেতন হয়ে উঠছি মাত্র এক দশকের মতো হবে। ক্ষুদ্র জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব চোখে পড়তেই আমাদের প্রায় চল্লিশটি বছর কেটে গেল। অথচ ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা কেবল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থেকে নয়, নিজেদেরও একে অন্যের চেয়ে পৃথক। আমরা তাদের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারিনি। তাদের পৃথক আত্মপরিচয় ও অভীষ্ট গন্তব্যের স্বীকৃতি দেওয়া থেকেও অনেক দূরে রয়েছি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৪টি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বাস। এরা হচ্ছে: অহমিয়া, বর্ন, বনাই, বসাক, বাকতি, বেদিরা, ভূমিজ, ভূঁইয়া, ভূঁইয়ালি, বম, চাকমা, চাক, ডালু, গারো, গুর্খা, হাড়ি , হরিজন, খাসিয়া,খাইরা, খিয়্যাং, খুমি, খাণ্ডা, কোচ, কোল, কর্মকার, কের, খাণ্ডো, লাহার, লুসাই, লুরা, মারমা, ম্রো, মনিপুরি, মাহাতো, মুণ্ডা, মালো, মাহদি, মিখির, মুসাহার, ওরাওঁ, পাংখো,পাহাড়িয়া, পাহান, পাল,পাত্র, রাখাইন, রাজোয়ার, রাই,রাংগুতার, রামদাস, রুহিয়া, রাজবংশী,শাক, শোরা, সাঁওতাল,শিং, তুরি, তঞ্চংগ্যা,ত্রিপুরা, তেলি,উশুই।

দেশবিভাগের পর থেকে সমতলের উদ্যোক্তা ও কৃষিজীবীরা প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জমি গ্রাস করছে।

সংখ্যালঘু এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে। সামাজিক-রাজনৈতিক পীড়ন এবং বাঙালিদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য এ দুয়ে মিলে তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে তুলেছে। এটা সত্যি যে, জাতিসংঘ এবং আরো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা সবধরণের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য চার্টার ও ঘোষণাপত্র তৈরি করছে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় অনন্যতা এবং তা সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা মাঝেমধ্যেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সুশীল সমাজের কিছু গ্রুপ এবং এনজিও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছু সচেতনতা দেখালেও সরকার এবং সাধারণ মানুষের অধিকাংশই এখনো এসব ইস্যু ও সমস্যার ব্যাপারে দৃশ্যত অজ্ঞ ও উদাসীন।

বিদ্যমান পরিস্থিতি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের মূল ধারার রাজনীতি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত একলাখ চাকমা ভূমিহীন ও গৃহহীন এবং ৬০ হাজার উদ্বাস্তু হয়েছে। সশস্ত্র সংঘাতে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীসহ নিহত হয়েছে প্রায় ২০ হাজার । জাতিগত সংখ্যালঘুদের অনেক বিশিষ্ট নেতা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ কিংবা বাঙালি ভূমিদস্যুদের গুণ্ডাপাণ্ডাদের হাতে খুন হয়েছেন বা সরকারি এজেন্সির হেফাজতে মারা গেছেন। এটা খুবই চড়া মূল্য যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এক দশকের বেশি সময় চলে গেলেও ওই অঞ্চলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কাজেই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশি সচেতন এবং বন ও জীববৈচিত্রের গুরুত্বের ব্যাপারেও ওয়াকেবহাল হতে হবে। কৃষিকাজ বেড়ে চলেছে এমন একটি জনবহুল দেশে কীভাবে এ বিষয়গুলো ঝুঁকির মুখে পড়ছে তা লক্ষ্য করতে হবে। দেশের বনভূমি প্রতিনিয়ত চাপের মুখে পড়ছে। এসব বিষয়ে আমাদের সচেতনতা ও অঙ্গীকার স্পষ্ট বা জোরালো নয় বলে বন ও সেই সঙ্গে তার অধিবাসীদের বিলুপ্তিই এদেশের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মিডিয়ার অনেক কিছু করার রয়েছে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সচেতন। উপমহাদেশে এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও বৈরিতার মধ্যে পাশাপাশি সহাবস্থানের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের কাছ থেকে এই বিষয়টি বর্তেছে বাংলাদেশের ওপর। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করে এদেশের জন্মলাভের মধ্য দিয়ে একটি নবযুগের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায়, বিশেষ করে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা বলে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল আমরা আজো তার উপশম করতে পারিনি।

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুরা, পাকিস্তান আমলের মতোই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মতো একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরি করতে আবারো ব্যর্থ হয়েছি আমরা।

মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতির - যা দেশের জঙ্গীগোষ্ঠীদের মদতদাতা --যে উত্থান তা শুধু ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকেই লক্ষবস্তুতে পরিণত করেনি, এর ফলে সাধারণভাবে নারীসমাজও প্রথাগত সমাজপতিদের নিপীড়ণমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের পর এবং সমাজে গৃহীত গণতান্ত্রিক উদ্যোগগুলো সাধারণভাবে পুরুষ প্রাধান্যবিশিষ্ট এবং তা নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের উপশম ঘটাতে পারে নি।

আমাদের সমাজে বিভেদের আরো জায়গা আছে। দেশে ধনী ও গরিবের ব্যবধান বাড়ছে। সম্পদ জড়ো হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। দেশের উন্নয়ন সুষমভাবে হচ্ছে না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জেলাশহর ও নগরী অবহেলার শিকার যেখানে প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নয়ন হচ্ছে না। নগরীর চেয়ে পল্লী অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা বেশি। সমাজে বিদ্যমান এ অসাম্য লালন করছে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যকে যা তৈরি করছে অবিশ্বাস। মানুষে মানুষে তৈরি হচ্ছে দূরত্ব।

এই বাস্তবতায় আমাদের সবাইকে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে। সমাজের এই উদ্যোগে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হবে মিডিয়াকেই।

(এ প্রবন্ধের রচয়িতা বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক। বর্তমানে তিনি দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'প্রথম আলো'-র চট্টগ্রামভিত্তিক আবাসিক সম্পাদক)

প্রবন্ধ ২

হিন্দুদের সম্পত্তি আজও "অর্পিত" সম্পত্তি

২০০১ সাল থেকে প্রায় ২ লাখ পরিবার ১.২২ লাখ বিঘা জমি হারিয়েছে

খাজা মইন উদ্দীন

২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল হওয়ার পর থেকে প্রায় ২ লাখ হিন্দু পরিবার ১ লাখ ২২ হাজার বিঘা জমি হারিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের ভিটেবাড়িও। এ সংক্রান্ত এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। 'অর্পিত' সম্পত্তি তাদের আদি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই আইনটি বাতিল করা হয়েছিল।

গবেষণাটি চালিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বারকাত। তিনি বলেছেন, দেশের ২৭ লাখ হিন্দু পরিবারের মধ্যে প্রায় ১২ লাখই (৪৪শতাংশ) ১৯৬৫ সালের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' এবং তার স্বাধীনতা-পরবর্তী সংস্করণ 'অর্পিত সম্পত্তি আইনে' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বারকাত বলেছেন, বর্তমান বাজার মূল্যে হিন্দু পরিবারগুলোর হারানো মোট ২২ লাখ একর (১ একর মোটামুটি ৩ বিঘা) জমির দাম ২,৫২,০০০ কোটি টাকা যা দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি।

আবুল বারকাত তার গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসারে লিখেছেন, " এটি আমাদের তৈরি করা একটি কৃত্রিম সমস্যা যা মানবতার চেতনা বিরোধী। একটি সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমাদের এই সভ্যতার পরিপন্থী বিষয়টি থেকে নিস্কৃতি পেতে হবে। না হলে আরো বড় ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে।" ক্ষতিগ্রস্ত লাখো পরিবারের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তি ও জীবন শীর্ষক গবেষণাপত্রটি পরে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলোকে তাদের হারানো জমি ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০১ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের উদ্দেশ্যে অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর আইন প্রবর্তন করে। এ উদ্যোগকে অনেকে নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটারদের তুষ্ট করার 'রাজনৈতিক চাল' হিসেবে সমালোচনা করেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমির মালিকানার ওপর এই আইনের প্রভাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে বারকাত দেখেছেন, অর্পিত সম্পত্তি আইনের ভিত্তিতে উচ্ছেদকৃত মানুষ বা দখলকৃত জমির পরিমাণের কোনো তালিকা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী লোকজন ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে বেশির ভাগ অর্পিত সম্পত্তি দখল করেছে। দখলকারীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ বিএনপি, ৩১ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৮ শতাংশ জামাতে ইসলামী এবং ৬ শতাংশ জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত।

আবুল বারকাতেরই করা অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক ১৯৯৭ সালের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে এর কৌতুহলোদ্দীপক বিপরীত চিত্র। দৃশ্যত তখন আওয়ামী ক্ষমতায় ছিল বলে জমি দখলে তাদের অবদান ছিল ৪৪ শতাংশ এবং বিরোধীদলে থাকা বিএনপির সুবিধাভোগীদের হার ছিল ৩২ শতাংশ।

সাম্প্রতিকতম গবেষণাটিতে বারকাত উল্লেখ করেছেন, নিকট অতীতে বিএনপির পাঁচ বছরের শাসনকালে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলোর ওপর তার আগের আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনকালের চেয়ে বেশি সহিংসতা ও নিপীড়ন হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক, ভূমি প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশ থাকা স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন, খোদ ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জালিয়াতি, শক্তিপ্রয়োগ, জাল দলিল ব্যবহার, বর্গা চাষী এবং আসল মালিকের মৃত্যু বা দেশত্যাগও ভূমি দখল ও 'অর্পিত সম্পত্তি' বহাল থাকার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

আবুল বারকাত দেখিয়েছেন যে, হিন্দু পরিবারগুলোর স্থানচ্যুতির ৫৩ শতাংশ এবং জমি দখলের ৭৪ শতাংশই ঘটেছে ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা লাভের আগে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দ্বিতীয় শত্রু সম্পত্তি আদেশ জারি করার পর তা ঘটে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের কায়দা হিসেবে আখ্যায়িত করে এ আইনের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল তখন।

১৯৯৭ সালে "বাংলাদেশের পল্লীসমাজে অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব: একটি অনুসন্ধান" শীর্ষক গবেষণার ফল প্রকাশিত হলে বিষয়টি মনোযোগের কেন্দ্রে আসে। জনমনে এ বিষয়ে সৃষ্টি হয় সচেতনা।

আবুল বারকাতের এবারের গবেষণায় ২০০১ সাল থেকে এ বিষয়ে যেসব অগ্রগতি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে নমুনা হিসেবে দেশের ১৬টি জেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ৪শ' ৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ঘটনা ব্যবহৃত হয়েছে।

৪২ বছর ধরে দেশের জনমানচিত্রে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা এই সমস্যার গভীরতার মাত্রা বিবেচনা করে আবুল বারকাত মনে করেন আদি মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাও একটি কঠিন কাজ হবে। তিনি বলেছেন, অর্পিত সম্পত্তির মালিক ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ৬০ শতাংশের বেশি হয় মৃত বা দেশত্যাগ করেছে।

এ সমস্যার "হিন্দু বনাম মুসলমান" মেরুকরণের ধারণাটিকে নাকচ করে দিয়েছেন এ গবেষক। তার মতে, সাম্প্রদায়িক ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এ ইস্যুটি তৈরি করেছে। "একটি জমি হিন্দু, মুসলমান না সাঁওতালের দুর্বৃত্তরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সম্পত্তি গ্রাসের সহজ উপায় পেলে তা কাজে লাগায় তারা"-বলেন বারকাত। অর্পিত সম্পত্তি আইনের এখনো রয়ে যাওয়া সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: এ ধরণের ঘটনা ও জমি চিহ্নিত এবং তালিকাভুক্ত করা, ২০০১ সালের আইনের কয়েকটি শর্তের সংশোধন যা কিনা এর বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, বিভিন্ন লোককে দেওয়া এ ধরনের সম্পত্তির ৯৯ বছরের লিজ বাতিল এবং এ সমস্যা সমাধানে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা।

আবুল বারকাত বলেছেন, ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা হলেও ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়নের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনার অবসান ঘটানোর পথ সুগম হয়নি।

"অর্পিত সম্পত্তি আইন হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশের সেবা করার ক্ষমতা হ্রাস করেছে। এর ফলে বঞ্চিত হয়েছে দেশ। এছাড়া একটি ক্ষুদ্র লুটেরা শ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অক্ষমতা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দুর্বলতাই প্রকাশ পায় যদিও তারা মূলত অসাম্প্রদায়িক-"মন্তব্য বারকাতের।
(নিউ এজ থেকে, ঢাকা, ২৬ মে, ২০০৭)

ঐক্যে নিরাপত্তা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি নির্দেশিকা

বাংলাদেশ, ২০০৮

ফটো: আজিজুর রহীম পিউ/ফ্রিকনিউজ

ভূমিকা

বাংলাদেশে কর্মরত সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের বিশ্বের অন্যান্য স্থানের সহকর্মীদের মতই গুরুতর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে প্রকাশ্য সহিংসতার অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের পরিস্থিতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিছু সশস্ত্র বিদ্রোহী দল তৎপর হয়ে উঠলেও এবং দেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি অঞ্চলে জাতিগত সংঘাত অব্যাহত থাকলেও এদেশে সংঘর্ষের মূল উৎস হচ্ছে তিক্ত রাজনৈতিক মেরুকরণ যার পরিণতিতে দাঙ্গা-সংঘাত ও গোলযোগ লেগেই থাকে।

সাংবাদিকরা প্রায়শ দু'পক্ষের এই সংঘর্ষের মধ্যে আটকা পড়েন। বারংবার তাদের প্রতি তলব আসে এই যুদ্ধে কোন এক দিকে যোগ দেওয়ার জন্য। এর ফলে তারা তাদের মৌলিক দায়িত্ব যেটি অর্থাৎ জনগণকে পক্ষপাতশূন্য ও আবেগহীনভাবে খবর জানানো তা পালনে ব্যর্থ হন।

যেদেশে রাজনীতি বলতে মূলত বোঝায় দেশের দুই প্রধান দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে গণমাধ্যমের মধ্যে জনগণের স্বার্থের রাজনীতিকে উপেক্ষা করার প্রবণতাই দেখা যায়। গণমাধ্যম সাধারণত যে "ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতির" খবর প্রকাশ করে থাকে, তাতে মোটের ওপর জনগণের আগ্রহ কমই। এছাড়া, প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার এক তীব্র সংকটের মুখোমুখি এদেশের গণমাধ্যম। মোটামুটি ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে, মুদ্রিত প্রচার মাধ্যম ২% এর চেয়েও কম মানুষের কাছে পৌঁছায়। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের নাগাল যদিও মুদ্রিত মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি, তার প্রধান আগ্রহ হালকা বিনোদনে, সংবাদ কিংবা চলতি ঘটনায় নয়।

সংঘাত না থাকলেও বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ওপর প্রভাবশালী ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে সমঝোতা করে চলার চাপ আছে। প্রতিষ্ঠান ও পরিচালকরা চাপ ও হুমকির মুখে পরা সাংবাদিকদের পাশে না দাঁড়াতে পারার ফলে এই অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। এক সাম্প্রতিক ঘটনায়, ধর্মীয় চরমপন্থীদের অপমান করার ফলে, ব্যঙ্গচিত্রকার আরিফুর রহমান বাংলাদেশের অগ্রগামী সংবাদপত্র থেকে তার চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

সরকারী বাহিনী এবং সংস্থাগুলো নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। ১৯৯২ সালের এক ঘটনা আজও বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মুখে ফেরে যখন কিনা নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা 'ঢাকা প্রেস ক্লাবে' ঢুকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য গুলি চালিয়েছিল। ওই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেওয়া হলেও তদন্তের রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি।

ভীতি সৃষ্টি করার এই পরিস্থিতি সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেসব সাংবাদিক ও সম্পাদকের সঙ্গে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টস্' (আইএফজে) কথা

বলেছে তারা জানিয়েছেন, বিতর্ক হতে পারে এমন কোন বিষয়কে গণমাধ্যম খুব সম্ভবত এড়িয়েই চলবে। সাম্প্রতিক কালের এই ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতার ফলে অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রকটভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন সাংবাদিকরা। যেমন ২০০৭ সালের বীজ বোনার মৌসুমে দরকারি বীজ, সার ও অনান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা নিয়ে রিপোর্ট করার বিষয়টি।

বাংলাদেশের ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের অন্যতম খুলনায় সাংবাদিকরা ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল এবং চরমপন্থীদের কাছ থেকে হুমকির মুখোমুখি হন। তাছাড়া চোরাচালানী ও পাচারকারীদের হুমকিরও শিকার হন তারা। ভারত অথবা মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি আরো বেশ কয়েকটি জেলায় একই সমস্যা বিরাজমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো অন্যান্য কিছু স্থানে, যেখানে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিন ধরে চলমান জাতিগত সহিংসতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সেখানে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক।

এই হ্যান্ডবুক সম্পর্কে

এই পুস্তিকার পরিকল্পনা করা হয়েছে একটি ব্যবহারিক গাইড হিসেবে, এটি কোনো তাত্ত্বিক কাজ নয়। যে সাংবাদিকরা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বসবাস ও কাজ করেন এবং যাদের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দায়িত্ব পালনে পাঠানো হয় তাদের এটি পড়া উচিৎ। এর বেশির ভাগ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে পেশাদার নিরাপত্তা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষক ও অনান্য নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে (তবে তারা এতে কোন প্রকার ঘাটতির জন্য দায়ী নয়)। প্রশিক্ষিত সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও পেশাদার সাংবাদিকের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রণীত নিরাপত্তা বিষয়ক কোর্সের সংখ্যা বাড়ছে। এই হ্যান্ডবুকের সবচেয়ে কার্যকর কিছু তথ্য ও পরামর্শ সংগৃহীত হয়েছে সেই সব সাংবাদিকদের কাছ থেকে যারা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ করে ফিরে এসে জানিয়েছেন কী তাদেরকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করেছে এবং কী তাদেরকে নিরাপদ রেখেছে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার মৌলিক বিষয়গুলো। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করবে বৈরী পরিবেশে কাজ করার জন্য সাংবাদিকের প্রস্তুতি এবং অপহরণের মতো বিশেষ সংকটের মুখে কী করণীয় তা নিয়ে। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু হল দাঙ্গা ও গোলযোগ এবং তা মোকাবেলার উপায়। চতুর্থ অধ্যায়ে থাকছে কিছু জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি যা সাংবাদিকদের জানা প্রয়োজন। সর্বশেষে, পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নিরাপত্তা ইস্যুতে সাংবাদিকদের সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ব্যাপারে সব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

অধ্যায় ১

সাংবাদিকদের নিরাপত্তার মৌলিক বিষয়গুলো

বিশ্বজুড়ে গত ১৫ বছরে দেড় হাজারেরও বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী দায়িত্বপালনকালে নিহত হয়েছেন। তাদের জীবন দিতে হয়েছে কারণ, তারা যা লিখেছেন বা বলেছেন তা কারো কারো পছন্দ হয়নি। ওইসব সাংবাদিক এমন বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়েছেন যার তদন্ত করা হোক এটা অনেকে চায়নি, কেউবা সাংবাদিকদের পছন্দ করেনি অথবা তারা 'ভুল সময়ে ভুল জায়গায়' গেছেন।

ঝুঁকি সব পেশাতেই কমবেশি আছে। যেহেতু সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে অনেকে যা লুকিয়ে রাখতে চায় তাকে আলোতে নিয়ে আসা সেহেতু তার ঝুঁকি বেশিরভাগ পেশার চেয়েই বেশি। তবে সাম্প্রতিককালে সাংবাদিকের ওপর ঝুঁকির মাত্রা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বের কোন কোন জায়গায় হয়রানি ও হুমকি বা আরো খারাপ কিছু সাংবাদিকতার অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ ও সংঘাতের খবর সংগ্রহের সময় বিপদ আরো বেড়ে যায় এবং সাংবাদিকদের অনেক সময় জীবনও দিতে হয়।

প্রতিটি মৃত্যুই পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের জন্য এক মর্মান্তিক ঘটনা এবং মেধার ও সম্ভাবনার অপচয়। তবুও এ অস্বাভাবিক মৃত্যু পুরো ছবিটি তুলে ধরে না, কারণ আনুষ্ঠানিক হতাহতের হিসেবে শুধু তাদের কথাই বলা হয় যারা যুদ্ধ অথবা সংঘাতে নিহত হয়েছে বা অন্য কোনোভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। হতাহতের আনুষ্ঠানিক হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় নিহত সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যে সাংবাদিক দ্রুত খবর পাঠাতে গিয়ে সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বা ক্লান্তির সীমা ছাড়িয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন অথবা যে সাংবাদিক খবরের মোহে রাস্তাও ভালো করে চেনে না এমন গাড়িচালকের হাতে তাদের জীবনটি সমর্পণ করে দিয়েছেন তাদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় না। যারা বেঁচে গেলেও মানসিক ও শারীরিক আঘাতের কারণে আর কোনদিন পুরোদমে কাজ করতে পারেন না তাদের কথা আমরা শুনতে পাইনা। সহকর্মীদের মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা অন্য সাংবাদিকদের ওপর যে প্রভাব ফেলে তা এতে স্থান পায় না। যে কাজ করে অন্যরা বিপন্ন হয়েছেন ওই সাংবাদিকরা হয়তো সে বিষয় নিয়ে কাজ করতে নিরুৎসাহিত হন।

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। হামলা বা আক্রমণ সাংবাদিকদের অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস করে এবং জনগণকে তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কখনো কখনো এটাই সহিংসতার উদ্দেশ্য। সমাজের অসাধু ব্যক্তিরা অনেক সময় সাংবাদিকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে সহিংসতা চালায় যাতে তারা তাদের অপকর্ম ফাঁস করতে না পারেন।

এটা স্মরণ করা দরকার যে, গত বছর পনেরো কালে নিহত সাংবাদিকদের ভেতর ৯০% এরও বেশি তারা যে দেশে জন্মেছেন ও বেড়ে উঠেছেন সেখানেই প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতের মধ্যে বিদেশি সাংবাদিকও রয়েছেন। তবে বেশিরভাগই হচ্ছেন স্থানীয়। নিজের কমিউনিটিতে কর্মরত একজন সাংবাদিক নিহত হলে বাইরে সে খবরের প্রভাব খুব কমই পড়ে। স্থানীয় সাংবাদিকরা অন্যদের চেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখোমুখি কারণ তারা তাদের এলাকায় থেকেই সংবাদ পাঠান। কাজ শেষ হলেই তারা উড়োজাহাজে চড়ে অন্যত্র সরে যেতে পারেন না।

সুতরাং এই হ্যান্ডবুকের প্রধান লক্ষ্য সেই সব সাংবাদিকরা যারা নিজেদের এলাকায় বা দেশে থেকেই কাজ করেন। বিদেশ থেকে আসা সাংবাদিকদের চেয়ে স্থানীয় এসব সাংবাদিক ও ক্যামেরা ক্রু অনেক বেশি

অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। স্থানীয় এসব সাংবাদিক, ক্যামেরা ক্রু ও ফটোগ্রাফারদের অনেক সময় বেশি ঝুঁকি নিতে হতে পারে। অথচ খারাপ কিছু ঘটলে তাদের বা তাদের পরিবারের জন্য প্রায় কোনো অবলম্বনই থাকে না। স্থানীয় সাংবাদিকরা বড় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের মত বীমা সুবিধা, সরঞ্জাম বা সমর্থন কোনোটাই পায় না । তাদের কোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠানোর সম্ভাবনাও কম। কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এমনকি তাদের পক্ষ হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়োগ করে। অথচ নিজের স্টাফদের যে নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়া হয় স্থানীয় সাংবাদিকদের তা তারা দেয় না।

নিয়মিত কর্মী ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের সমান অধিকার এবং উন্নততর সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও বীমা সুবিধার জন্য ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মধ্যে এই সমস্যার কিছু সমাধান নিহিত আছে। বিশেষ করে ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিকদের জন্য এর প্রয়োজন অনেক বেশি যাদের অনেকেই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু নিয়মিত স্টাফরা যে সুরক্ষা পেয়ে থাকেন তার কোনোটাই এরা পান না। এই হ্যান্ডবুকের একটি লক্ষ্য হচ্ছে অধিকতর নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাংবাদিক ,তাদের প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সচেতনা বাড়ানো। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও তাদের পরিবারের কল্যাণে আরো বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য মিডিয়া মালিকদের ওপর সাধারণভাবে যে দাবিটি রয়েছে এটি তারই অংশ।

নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে সব ধরণের আলোচনায় ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিকদের আরো বেশি আইনী সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

তবে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদেরও নিজেদের নিরাপত্তা বাড়ানো এবং ঝুঁকি হ্রাসে অনেক কিছু করণীয় আছে। ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের একে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত যদিও তারা হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কিভাবে উস্কানিমূলক সাংবাদিকতা ও নিম্নমানের সংবাদ পরিবেশন স্থানীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তিক্ত করার মাধ্যমে সব সাংবাদিকের জন্যই নেতিবাচক পরিণতি বয়ে আনে তা-ও সাংবাদিকদের বুঝতে হবে।

সাংবাদিকদের যারা সহিংস আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন তারা 'ভাল' বা 'খারাপ' সাংবাদিক বাছবিচার করেন না। তারা যাকে নাগালের মধ্যে পায় তাকেই আক্রমণ করে। ভাল মানের সাংবাদিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের ব্যাপারে সব সাংবাদিকের ভূমিকা রয়েছে যদিও শুধুমাত্র এটাই তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না।

নিরাপত্তার গুরুত্ব

নিরাপত্তা একটি ইতিবাচক গুণ। ভালোভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন হওয়ার অংশ বিশেষ। নিরাপত্তা একটি সম্পদ, বোঝা নয়। একজন ভালো সাংবাদিক নিরাপত্তা সচেতনার বিষয়টি চর্চার মাধ্যমে অর্জন করেন, যেমন করে তিনি অর্জন করেন সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুণ। নিরাপত্তা মানে আগেভাগে চিন্তা করা, প্রস্তুতি নেওয়া, কী ঘটছে এবং তার অর্থ-ই বা কী তা পর্যবেক্ষণ করা।

ভালো গাড়ি চালক রাস্তার দিকে নজর রাখেন, আর দ্রুতগতির চালকের চোখ থাকে স্পিডোমিটারের দিকে। সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে যা ঘটেছে তা বলা, নিজেই সংবাদ হয়ে যাওয়া নয়। কোনো সাংবাদিক অপ্রয়োজনে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিলে তা হবে অপেশাদার আচরণ। এর ফলে যে ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট হতে পারতো বা যে ছবি জনগণ দেখতো পারতো তা আড়ালেই থেকে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্বপালনকালে কিছু সাংবাদিক, আলোকচিত্রী এবং ক্যামেরা অপারেটরের মধ্যে একধরণের বাহাদুরি আর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। তবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কাজ করা, তা ক্ষণিকের তীব্র উত্তেজনার প্রকাশ নয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে, 'মৃত্যু বা যশের' মনোভাব পোষণকারী সাংবাদিকরা সাধারণত মৃত্যুর চেয়ে যশের ওপরই গুরুত্ব দেন এবং মারাত্মক জখম সম্পর্কে কদাচিৎ চিন্তা করে থাকেন। যা তাদের ক্যারিয়ারের ইতি টানতে পারে।

অপরিণামদর্শী সাংবাদিকরা তাদের সহযোগী স্ট্রিঙ্গার, গাড়িচালক এবং দোভাষীদের জীবনকেও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেন। অনেক সময়ই এ ঝুঁকি অপ্রয়োজনীয়। ঘটনার খুব কাছে যেতে পারলেই যে রিপোর্টিং আরো ভালো হবে এবং অধিকতর আবেদনময় ছবি পাওয়া যাবে তা সবসময় ঠিক নয়। কোনো প্রতিবেদন বা ছবির মূল্যই কী জীবনের চেয়ে বেশি? এমনকী সবচেয়ে ভালো প্রতিবেদন বা ছবিটির তখনই মূল্য আছে যখন জনগণ তা পড়া বা দেখার সুযোগ পায়। নিহত বা আহত সাংবাদিক খবর বা ছবি পাঠাতে পারেন না। নিহত সাংবাদিকের চেয়ে বেঁচে থাকা একজন সাংবাদিক অতুলনীয়ভাবে বেশি কার্যকর। কোনো পেশা থেকে সবধরণের বিপদকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু সাংবাদিকরা বিপদ আঁচ করে আগেভাগেই প্রস্তুতিগ্রহণ, ঝুঁকিহ্রাস এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করার জন্য অনেক কিছুই করতে পারেন। বিপদ বুঝে আগে ভাগেই ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিপদ হ্রাসের ব্যাপারে প্রত্যেক সাংবাদিকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে। এছাড়া অধিকতর নিরাপদ কাজের পরিবেশের জন্য সাংবাদিকদের সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে আন্দোলন করা যৌথ দায়িত্ব।

হতাহতের অগ্রহণযোগ্য হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সাংবাদিক, তাদেও সংগঠন এবং নিয়োগকর্তা সবারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সরকারের ভূমিকা

সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলার ক্ষেত্রে কখনো কখনো সরকার সরাসরি জড়িত থাকে। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে সাংবাদিকদের প্রতি সরকারের একটি দ্বৈত মনোভাব রয়েছে। সাংবাদিকদের সুরক্ষার বিষয়টিকে মূখ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে না। গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় সরকারের উদ্বেগহীনতা দেখে প্রতিবছরই গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকামী গ্রুপ ও সাংবাদিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের খুব কম ঘটনার যথাযথ তদন্ত হয়। আর অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করা হয় আরো কম।

প্রায়শই এরকম প্রতীয়মান হয় যে, হত্যাকারীরা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে লক্ষবস্তু করলেও শাস্তি পায় না। সাংবাদিকরা ভয়ে থাকলে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু অনেক রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা এটা মনে করেন যে একজন ভীত সাংবাদিকই একজন নতজানু সাংবাদিক। এমনকি যে সব সরকার তাদের গণতান্ত্রিক পরিচয়ের জন্য গর্ব অনুভব করে তারাও সাংবাদিকদের বিপদের মধ্যে ফেলেন

যখন কিনা তারা পুলিশ বা আদালতকে সাংবাদিকের কাগজপত্র জব্দ করার অধিকার দেন। কিংবা এমন আইন পাশ করে যা সাংবাদিকদের তাদের সংবাদ সূত্র প্রকাশ বা গোপন তথ্য হস্তান্তরে বাধ্য করে।

এ সব আইন সাংবাদিকদের দৃশ্যত রাষ্ট্রেরই কোনো বাহিনীতে পরিণত করে কাজেই দাঙ্গা ও গোলযোগে জড়িতরা বিশ্বাস করে যে সাংবাদিকের চোখে পড়া আর পুলিশের নজরে থাকা একই কথা।

সাবেক যুগোস্লাভিয়া বিষয়ক যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইবুনাল যখন ওয়াশিংটন পোস্টের সাবেক রিপোর্টার জোনাথন র‍্যানডালকে বসনীয় সার্ব রাদোস্লাভ ব্রাদিয়ানিনকে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে তথ্য দিতে বাধ্য করার জন্য তলব করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপিত হয়। র‍্যানডাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্রাইবুনাল তার আপিল মঞ্জুর করে সাংবাদিকদের সাক্ষ্যদানে বাধ্য করার ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতাই ব্যাপকভাবে সীমিত করে। আদালত স্বীকার করে নেয় যে এটা করা হলে সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতার ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে।

আদালত রায়ে আরো বলেছিল, যুদ্ধ প্রতিবেদকদের রাষ্ট্রপক্ষের জন্য সম্ভাব্য স্বাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কাজটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। কারণ, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা সাংবাদিকের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে না-ও পারে বা তাদের সংঘাত-কবলিত এলাকায় প্রবেশে বাধা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ প্রতিবেদকরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পর্যবেক্ষক থেকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে যাতে করে তার নিজের জীবনই ঝুঁকির মুখে পড়ে।

ট্রাইব্যুনাল অবশ্য সাংবাদিকদের ভবিষ্যতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার বিষয়টি নাকচ করে দেয়নি। আদালত রায়ে বলেছিল, সাংবাদিকের সাক্ষ্য যদি একটি মামলার মূল বিষয়ের মীমাংসা করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং অন্য কোনো সূত্রে তা সংগ্রহ করা না যায় তখন তাকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যেতে পারে। অনেক সাংবাদিকই হয়তো বলবেন, তারা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে রাজি হতে পারেন কিন্তু এজন্য তাদের বাধ্য করা উচিত হবে না। সাংবাদিকদের এটি করতে বাধ্য করা হলে সরকার তাদের বিপদের মুখে ঠেলেন এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের যে বিশেষ ভূমিকাটি রয়েছে তাকে খর্ব করেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আচরণবিধির পথে অভিযাত্রা

১৯৯৮ সালে আইএফজে এবং বিবিসি, দি ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (ইউকে এবং আয়ারল্যান্ড) এবং গণমাধ্যম কর্মীদের ইউনিয়ন 'মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল'সহ একদল সমমনা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করে।

দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএফজে 'কোড অব প্র্যাকটিস ফর দি সেফ কনডাক্ট অব জার্নালিজম' প্রণয়ন করে। এর পর এপি, বিবিসি, সিএনএন, আইটিএন এবং রয়টার্স তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা আচরণবিধি তৈরি করে।

বিশ্ব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপত্তার বিষয়টিতে আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এবং নিজেদের কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি তৈরি করে। কিন্তু এই শুভ পদক্ষেপ যারা নিরাপত্তাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ, বীমাসুবিধা ও সরঞ্জামাদি দেয় এবং যারা দিতে পারে না তাদের মধ্যকার ব্যবধানটি প্রকট করে তুলেছে। আরও কিছু সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান এ আচরণবিধি গ্রহণ করলেও খুব কম সংবাদপত্রই এটি গ্রহণ করেছে। এবং অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানই তাদের সাংবাদিকদের নিরাপত্তাকে ততোটা গুরুত্ব দেয়না।

নামকরা এক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের এক সাংবাদিক আফগানিস্তানে পাঠানোর আগে তার জন্য নিয়োগকর্তার নিরাপত্তার প্রস্তুতির বিষয়টিকে সংক্ষেপে তুলে ধরেন এভাবে: " তারা আমাকে বলেছিল, 'সাবধানে থেকো'।"

আইএফজে গত বিশ বছর ধরে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য প্রচারভিযান চালিয়ে আসছে। তারা বড় কোন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নন এমন সাংবাদিকদের জন্য প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা বিষয়ক কোর্সের আয়োজন করেছে।

আইএফজে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিতে ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু যৌথ পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে। আইএফজে-র কোড অব প্র্যাকটিস ফর দা সেফ কন্ডাক্ট অব জার্নালিজম-এ নিয়মিত কর্মী ছাড়াও ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিকদের জন্যও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ঝুঁকি সচেতনা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২০০২ সালের নভেম্বরে আইএফজে এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) অন্যান্য বেশ কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠন, স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য আন্দোলনকারী গ্রুপ, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সমিতিগুলোর সঙ্গে মিলে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সহায়তার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইনস্টিটিউট (আইএনএসআই) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্মত হয়। সাংবাদিকতায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি নেটওয়ার্ক হিসেবে ২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করা এই ইন্সটিটিউট এখন তথ্য ও উপকরণ বিনিময়ের ওপর জোর দিচ্ছে। ফ্রিল্যান্স ও নিয়মিত কর্মী উভয়ের জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। আইএনএসআই আঞ্চলিক গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে তাদের মূল পৃষ্ঠপোষক গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অধ্যায় ২

বৈরী পরিবেশে কাজ করার প্রস্তুতি

সাংবাদিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্বপালনের সময়ই সবচেয়ে স্পষ্ট ঝুঁকির মুখোমুখি হন। কারণ এসময় তারা কাজ করেন বন্দুক, বোমা, মাইন, রকেট বা কামানের গোলার আওতার মধ্যে। কিন্তু সাংবাদিকের জন্য বৈরী পরিবেশের পরিসর যুদ্ধক্ষেত্রে সীমিত নয়। নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথাগত যুদ্ধের চেয়ে দাঙ্গা বা গণ অসন্তোষের সময় দায়িত্বপালনকালে সাংবাদিকদের শারীরিক ঝুঁকি সম্ভবত অনেক বেশি।

একজন সাংবাদিক যখন তার কর্মস্থলের বাইরে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া কাজ করেন তখন তাকে এই ঝুঁকিগুলোর মুখে পড়তে হয়ঃ

- অসুস্থতা
- সড়ক ও অন্যান্য দুর্ঘটনা
- গণমাধ্যমের ওপর পরিকল্পিত হামলাসহ বিভিন্ন সহিংসতা
- চরম ক্লান্তি
- মানসিক বিপর্যয় এবং নৈতিক মনোবলের অধোগতি

যুদ্ধে হতাহতের চেয়ে অসুস্থতা অথবা সড়ক দুর্ঘটনাই সাংবাদিকদের কাবু করে বেশি। সাংবাদিক জ্বর বা খাদ্য বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং তিনি সংবাদ পাঠাতে পারেন না।

প্রধান ঝুঁকিগুলো

সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতা অনেক সময়ই আসে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। যেমন, যখন কোন সাধারণ বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠে বা ক্ষুদ্ধ জনসাধারণ গণমাধ্যমের ওপর তাদের হতাশাজনিত ক্ষোভ ঝাড়ে। বৈরী পরিবেশ এবং গতানুগতিক রুটিনের বাইরের চাপের জন্য নিজেদের তৈরি করতে সাংবাদিকদের উচিত বিচিত্র ধরণের বিষয় নিয়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করা।

একজন সাংবাদিককে মানসিক ও শারীরিকসহ সব দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সাংবাদিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া, প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করা এবং ভাগ্যের ওপর ভরসা না করে পরিস্থিতি যতদূর সম্ভব নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। কোন সাংবাদিকই কখনও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। এবং 'শুন্য ঝুঁকি' বলে কিছু নেই। কিন্তু প্রত্যেক সাংবাদিকের উচিত ঝুঁকি খতিয়ে দেখে বিপদ সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হওয়া।

এমনকি যেসব পরিস্থিতি তেমন একটা বিপদজনক বলে মনে হয় না, অপ্রস্তুত থাকলে তা-ও সাংবাদিক বা ক্যামেরা ক্রু-র জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সবচেয়ে বিপদজনক পরিস্থিতিকেও অনেকখানি নিরাপদ করা

যায় ঝুঁকি নিরূপণ ও পূর্বপ্রস্তুতির মাধ্যমে।

পরিকল্পনা ভালো হলে কেবল সাংবাদিকের ঘটনাস্থলে যাওয়া এবং কাজ শেষে নিরাপদে ফিরে আসাটাই নিশ্চিত হবে না, সংবাদের প্রধান উপাদানগুলো চিহ্নিত করা বা পরিস্থিতির পটভূমি জানতে তা সাহায্য করে। এছাড়া এ বিষয়টি খবর ও ছবি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে আরো বেশি কার্যকর ও সমৃদ্ধ করবে।

অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে

ক) অ্যাসাইনমেন্টটি করার মতো শারীরিক সক্ষমতা আপনার রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

ক্যারিয়ারের উন্নতি হতে পারে বলে মনে করলে অধিকাংশ সাংবাদিকই কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিতে পিছপা হন না এমনকি তা বিপজ্জনক হলেও। তবে প্রত্যেক সাংবাদিকের উচিত নিজের প্রতি সৎ থাকা। আপনি কি শারীরিকভাবে যথেষ্ট সক্ষম? নিরাপত্তার জন্য আপনি কি রাতভর হাঁটতে বা ছুটতে পারবেন? আপনি কি হোটেলের আরামদায়ক পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে কাজ করতে পারবেন? ফিটনেসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে আপনাকে শারিরীক পরিশ্রমের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

খ) স্থানীয় পরিস্থিতি আরো ভালো করে জানুন

যেখানে আপনি যাচ্ছেন সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? প্রধান পক্ষগুলো কারা? আপনি কি সেখানকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জেনে নিয়েছেন? সাধারণভাবে গণমাধ্যমের প্রতি এবং বিশেষ করে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে? জাতিগত পরিচয় কি আপনার জন্য বাড়তি ঝুঁকির কারণ? সেখানকার কোন গোষ্ঠীর সাংবাদিক বা বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি সহিংসতা বা নৃশংসতা সংঘটনের নজির আছে কি? 'যাওয়া যাবেনা' এমন কোন এলাকা রয়েছে কি? এজন্য কী ধরণের অনুমতি নিতে হবে এবং কার কাছ থেকে তা নিতে হবে? রওয়ানা দেওয়ার পর এ অনুমতির কোনো মূল্য থাকবে কি?

এসব বিষয় এমনকি স্থানীয় সাংবাদিকদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। তারা দেশের এমন কোনো অঞ্চলে যেতে পারেন যা তারা ভালো করে চেনেন না বা যেখানে একটি ভিন্ন ভাষা বা উপভাষায় কথা বলা হয়। এমনও হতে পারে সেখানকার কোনো বিশেষ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে ঢালাওভাবে গণমাধ্যম অথবা নির্দিষ্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ মনোভাব রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, যেসব সাংবাদিক ও ক্যামেরা অপারেটর স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন তারা কমিউনিটির কাছ থেকে বেশি সহায়তা পায়। এবং সম্ভাব্য হুমকি থেকে বেশি সুরক্ষাও পেয়ে থাকে তারা।

ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রস্তুতি

- কোনো সন্দেহ হলে অন্য একজন সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করুন। অপরিচিত এলাকা ভ্রমণকালে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওই এলাকার ঝুঁকির বিষয়ে তাদের কথা শুনুন।

- সঙ্গে একটি মানচিত্র রাখুন। আপনি এলাকাটি সম্পর্কে ভালভাবে না জানলে, একটি ভাল হালনাগাদ মানচিত্রের সাহায্য নিন।

- যারা আপনার প্রতিবেদনের 'বিষয়' তারা আপনাকে কীভাবে দেখছে?

প্রধান পাত্রপাত্রীরা আপনাকে কিভাবে দেখবেন? সাংবাদিকদের প্রতি তাদের মনোভাব কী? আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের কি কোনো বৈরিতা আছে? সংঘাত পরিস্থিতিতে আপনাকে কি কেউ কোনো একটি 'বিশেষ পক্ষের লোক' বলে চিহ্নিত করতে পারবে?

ভাষাজ্ঞান একটি মূল্যবান সম্পদ। যদি আপনি কোন একটি স্থানে কিছুদিনের জন্য কাজ করতে যান তাহলে কমপক্ষে সেখানকার ভাষার মৌলিক বিষয়গুলো রপ্ত করুন। সাংবাদিকদের অনেক সময় খবর সংগ্রহে অল্পসময়ের নোটিশে এমন জায়গাতে পাঠানো হয় যেখানে তাদের ভাষা কেউ বোঝে না অথবা সে ভাষাকে বৈরিতার সঙ্গে দেখা হয়। কোনো ভাষা রাতারাতি শেখা যায় না। তবে আপনি যদি স্থানীয় ভাষায় সম্ভাষণ জানান তাহলে লোকজন সাধারণত ইতিবাচক সাড়া দেয়। কয়েকটি জরুরি বাক্য শিখে নিন: যেমন, 'আমি একজন সাংবাদিক', 'আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?' বা 'আমার একজন ডাক্তার প্রয়োজন'।

কোন দেশ বা অঞ্চলে প্রথমবারের মতো গেলে দেখবেন সেখানকার অনেক কিছুই আপনি জানেন না। ভাল সাংবাদিক সব কিছুই জানবেন তা নয়, কিন্তু তারা ভালো প্রশ্ন করতে পারেন এবং দ্রুত শিখে নেন। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক আপনাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন যা আপনাকে দ্রুত শিখতে সাহায্য করবে। তবে কিছু অভিজ্ঞ সাংবাদিক কিন্তু চরম নৈরাশ্যবাদী এবং নতুন চিন্তার পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সেই সব সাংবাদিকের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাদের সমাজ ও জনগণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। যেসব স্থানীয় সাংবাদিক তার এলাকা ও আশেপাশের মানুষ সম্পর্কে অহরহ অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করেন তাদের কাছ থেকে ওই এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে বিশেষ কোনো লাভ হবে না।

নিজের অধিকার জানুন

অনেক সাংবাদিক কোনো অঞ্চল বা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে খুব সামান্য বা কোনো ধারণা ছাড়াই ওই অঞ্চলে যান। সেই সঙ্গে তারা হয়তো 'স্বাধীন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক' হিসাবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন থাকেন না। খুব কম সাংবাদিকই জেনেভা কনভেনশন এবং মানবাধিকার আইনের সেইসব প্রাসঙ্গিক ধারা সম্পর্কে জানেন যাতে সাংবাদিকদের মতো নিরপেক্ষ পক্ষের অধিকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাংবাদিকদেরকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। রওয়ানা হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী সম্পর্কেও জানতে হবে তাদের।

সামাজিক সুরক্ষা

খারাপ কিছু ঘটে গেলে কী হবে? আপনার কি বীমা করা আছে? আপনার পরিবারের কি ঘটবে?

বাংলাদেশে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফটোসাংবাদিকরা হরহামেশাই বাঁধার মুখোমুখি হন। কখনও কখনও তারা শারীরিক হামলারও শিকার হন। ঢাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে দৈনিক যুগান্তরের ফটোসাংবাদিক এএসএম গোর্কিকে র‍্যাব সদস্যরা বাঁধা দেয় ও এক পর্যায়ে মারধর করে। এ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফটোসাংবাদিকরা জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে তাঁদের ক্যামেরা মাটিতে রেখে প্রতিবাদ জানান। (২৫ মে,২০০৬)
ফটো: আজিজুর রহীম পিউ/দৃকনিউজ

www.reuters

তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হতে পারে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন। শারিরীক বা মনস্তাত্ত্বিক আঘাত থেকে পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘ সময়েরও প্রয়োজন হতে পারে। সাংবাদিকদের এ ভরসা থাকা উচিত যে, আঘাতের কারণে কাজ করতে না পারলেও তাদের আয় বন্ধ হবে না এবং তাদের মৃত্যু হলে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তি দেখাতে পারে যে তাদের এ ধরনের নিশ্চয়তা দেওয়ার মত অর্থ নেই। কিন্তু কোনো একজনকে এর ব্যয় বহন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে এ অত্যাবশ্যক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ফ্রি ল্যান্স ও নিয়মিত কর্মী উভয়ের জন্য সমভাবে বীমা ও চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে।

সংবাদ ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ লাইন ঠিক করুন

কর্মস্থলের বাইরে গেলে, সংবাদ ডেস্ক বা প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ সমস্যাপূর্ণ হয়ে পড়তে পারে। বার্তা বিভাগের সিনিয়র ব্যবস্থাপকরা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের যখন-তখন না পেলে প্রায়শই হতাশ হয়ে পড়েন। এটাও মনে রাখা দরকার যে, কেউ যদি আপনার অবস্থান এবং কি করছেন তা না জানে সেটা আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সব ধরণের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের উচিত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তাদের গতিবিধি অবহিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আপনি কখন ফোন করে নিউজ ডেস্ককে পরিস্থিতি জানাবেন তার সময়সীমা ঠিক করুন। যারা অফিসে বসে আপনার কপি বা ছবি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তারা নিজেরাও চাপের মধ্যে থাকেন এবং মাঠপর্যায়ে ছোটখাটো কাজ করতেও যে প্রতিবেদকের অনেক সময় লাগতে পারে সে বিষয়টি তাদের খেয়াল না-ও থাকতে পারে। অফিসে অপেক্ষারত বার্তা ব্যবস্থাপকরা প্রায়শ নিজের প্রতিবেদক বা আলোকচিত্রীর কাছ থেকে যা পেলেন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কী প্রচার করলো তাতে বেশি আগ্রহ দেখান।

অনেক সময়ই নিউজ ডেস্ক এটা ভুলে যায় যে, সংবাদের বৈচিত্র্য বলতে সংবাদের বিভিন্নতাকেই বোঝায়। কাজেই নিউজ ডেস্কের জন্য একটি ভালো পরামর্শ হচ্ছে নিজেদের সাংবাদিক বা আলোকচিত্রীর পাঠানো সংবাদ ও ছবির ওপর আস্থা রাখা। প্রতিদ্বন্দ্বী একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই প্রচার করেছে এমন স্টোরির পেছনে ছুটে নিজেকে বিপন্ন করা সাংবাদিকের জন্য বোকামি ছাড়া কিছু নয়। এমনকী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত সেই খবর বা ছবি নিজেদের সংবাদকর্মীরা ইতিমধ্যেই যা পাঠিয়েছে তার চেয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে পারে।

নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা জড়িত এমন দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র মাঠপর্যায়ে কর্মরতরাই। অতি উৎসাহী নিউজ ডেস্ক ব্যবস্থাপকদের চাপে বোকার মতো কোনো ঝুঁকি নেবেন না। একইভাবে সংবাদ ডেস্ক ও প্রযোজকরা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সাংবাদিকদের কাছে এই দাবিটি করতে পারেন যে কিছু বিষয়ে তাদের কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিতে হবে। যেমন: সীমান্ত অতিক্রম, সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য কোনো বিদ্রোহী বাহিনী বা নিষিদ্ধ দলের কারো সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে।

বার্তা ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে প্রতিবেদক, আলোকচিত্রী ও ক্যামেরা ক্রু এরকম একটি সমঝোতায় পৌঁছবেন এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলবেন।

ঝুঁকি ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমতের জন্য যে আলোচনা হবে তাতে সকল মাঠপর্যায়ের কর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। এসব ঐকমত্য লিখে রাখতে হবে এবং যদি কোন সংঘাত বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি কিছু সময় ধরে চলে তাহলে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে তা সময় সময় হালনাগাদ করতে হবে। এটি পর্যায়ক্রমে একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বা প্রটোকলে পরিণত হবে। প্রটোকল হালনাগাদ করার সময় সূত্র, ঝুঁকির বিশেষ ক্ষেত্র এবং সাহায্যের উৎস সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশ ও তা বিনিময় করতে হবে। সাংবাদিকদের অবশ্যই তথ্য আদান-প্রদানে তৈরি থাকতে হবে যা জীবন বাঁচাতে সহায়তা করতে পারে। মাঠ থেকে ফিরে আসা সাংবাদিকরা অন্যদের ব্রিফ করবেন যাতে অফিসে সংরক্ষিত তথ্য যতদূর সম্ভব হালনাগাদ করা যায়। কোন সাংবাদিক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে কী করা হবে সে ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হবে এ প্রটোকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি কোন সাংবাদিক জানে আটক হলে বা বিপদে পড়লে তার প্রতিষ্ঠান কী ব্যবস্থা নেবে তাহলে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ হয়। প্রতিটি প্রটোকলেই আঘাত,অসুস্থতা বা অবনতিশীল পরিস্থিতিতে সাংবাদিককে সরিয়ে আনার পরিকল্পনা থাকা উচিত।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে নিন

কাজে লাগতে পারে এমন সরঞ্জামের শেষ নেই। কত সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে পারবেন তা নির্ভর করবে আপনি কোথায় আছেন এবং হাতের কাছে কী আছে তার ওপর। তবে খুব সহজে বহন করা যায় এমন সবচেয়ে জরুরি 'সরঞ্জামটি' হচ্ছে প্রেস কার্ড।

প্রেস কার্ড একজন সাংবাদিকের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এতে তার ছবি থাকে। সাংবাদিকের নিজের প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা, বা ট্রেড ইউনিয়ন এ কার্ড বিতরণ করতে পারে। সব দেশেই সাংবাদিকদের জন্য সরকারী স্বীকৃতির নিয়মকানুন রয়েছে। তবে কখনো কখনো নবীন এবং আঞ্চলিক ও প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য এ বিধিমালার শর্ত পূরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে প্রেস কার্ড বিতরণের বিষয়টি দেখতে হবে কঠোর কিন্তু স্বচ্ছ মানদণ্ডের ভিত্তিতে। পেশাজীবী সংগঠনের ইসু করা প্রেস কার্ড সাংবাদিকরা যে একটি যৌথ পেশার মানুষ সেই ধারণাকে আরো জোরালো করে।

সুনির্দিষ্ট একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রেস কার্ড একজন সাংবাদিককে সাহায্য বা তার কাজকে বাধাগ্রস্ত দু-ই করতে পারে। তবে তা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সংঘাতে জড়িতদের কী ধারনা তার ওপর। আপনি সামরিক বা পুলিশ কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরিত চিঠি বা পাস সঙ্গে রাখতে পারেন যাতে আপনাকে সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ওই বাহিনীর লোকজনকে অনুরোধ করা হয়েছে। সম্ভাব্য বিপদের মুখে এসব চিঠি বা পাসের মূল্য কতটুকু তা অবশ্য খতিয়ে দেখতে হবে। জরুরি টেলিফোন নম্বরের একটি তালিকা সঙ্গে রাখুন। নম্বরগুলোর পাশে লিখে রাখুন আহত হলে কাকে ফোন করতে হবে। চুরি ঠেকাতে একটি ডামি মানিব্যাগ সঙ্গে রাখুন।

টাকা ও জরুরি কাগজপত্র চোখে না পড়ে এমন জায়গায় রাখুন। তবে দুর্বৃত্তরা চাইলে দিয়ে দেওয়া যায় এমন কিছু জিনিস ও অল্প পরিমাণ টাকা হাতের কাছে রাখলে ভালো। আরো কিছু টাকা ও পুরনো

ক্রেডিট কার্ডসহ একটি বাড়তি মানিব্যাগ রাখুন। ছিনতাইকারীর কবলে পড়লে এগুলো দিয়ে দিন। আপনার টাকা নিরাপদ থাকবে।

সাংবাদিক হিসাবে লক্ষ্যবস্তু হওয়া

সাংবাদিকের এবং বিশেষ করে ক্যামেরার উপস্থিতি ঘটনা ও বিবদমান পক্ষগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে। বৈরিতার লক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। দাঙ্গাকারী, পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কোনো হত্যাকাণ্ড বা সহিংসতার ঘটনা দেখলে শান্ত ও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন। ফিল্ম লুকিয়ে রাখুন। ক্যামেরা রাখুন ঢেকে। খোদ নিরাপত্তা বাহিনীসহ দাঙ্গাকারী ও অন্য আইন ভঙ্গকারীরা এ ব্যাপারে সচেতন যে, প্রচারিত সংবাদ বিশেষ করে মিডিয়ার সরবরাহকৃত ছবি বা ভিডিওচিত্র তাদের বিচারের জন্য নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

গোলযোগ কবলিত এলাকায় আইন ভঙ্গকারীরা যদি মনে করে সাংবাদিকের উপস্থিতির কারণে তাদের দাপট খর্ব হচ্ছে তাহলে তারা সব সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে পারে। সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে তা হলো হয়তো প্রত্যক্ষদর্শীকেই সরিয়েই ফেলা হলো- বিশেষ করে যার সঙ্গে ক্যামেরা ও রেকর্ডিং সরঞ্জাম ছিল। এমন পরিস্থিতিতে আপনি এমন ভাব দেখান যে, আপনি কিছুই দেখেননি এবং যতদূর সম্ভব দ্রুত ও নীরবে স্থান ত্যাগ করুন।

অপহৃত ও জিম্মি হলে যা করণীয়

পণবন্দী করার ঘটনা এখনো তুলনামূলকভাবে বিরল। তবে এ বিষয়টি খুবই নাটকীয়। অধিকাংশ অপহরণের ঘটনা স্বল্পমেয়াদের যা মাত্র কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। অধিকাংশ জিম্মিই শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে আসেন। জিম্মি হিসেবে আটক হওয়া খুবই ভীতিকর ও বিপজ্জনক এক অভিজ্ঞতা যাতে নিজের ভাগ্যের ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কেউ আপনাকে জিম্মি করলে তারা আপনার সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জিম্মি অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পান। কিন্তু জিম্মি হিসেবে মুক্তির জন্য আলোচনা প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা নগণ্য এবং নিরাপদে মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অপহরণের ঘটনার পর সহিংসতার মাত্রা সম্ভবত বাড়ছে।

জিম্মি করার কারণ

- জিম্মিদের একটি রাজনৈতিক 'পণ্য' মনে করা হয়।
- তাদের গণ্য করা হয় একটি অর্থনৈতিক 'পণ্য' হিসেবে।
- প্রতিশোধ নিতে।
- বীমা নীতি হিসাবে।
- পরিচয় ভুল করে।

জিম্মি করার ঘটনা অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে। আপনি নিজে কতোটা জিম্মি হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন তা খতিয়ে দেখতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুনঃ

- আপনি যে এলাকায় কাজ করছেন সেখানে কি জিম্মি করার ঘটনা ঘটে থাকে?
- সেখানে সাংবাদিকদের জিম্মি করার কোনো নজির আছে কি?
- নিজেকে প্রশ্ন করুন এবং অন্যকেও জিজ্ঞেস করুন ওই এলাকায় আপনার নিজের জিম্মি হওয়ার ঝুঁকি বেশি না মাঝামাঝি মাত্রার? যদি কোনো খ্যাতনামা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার ঝুঁকি বেড়ে যাবে। এছাড়া যদি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন যে সরকারকে কিনা সম্ভাব্য অপহরণকারীরা পছন্দ করে না।

ঝুঁকির মাত্রা খতিয়ে দেখার সময় পরিস্থিতিটি বিচার করুন জিম্মিকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আপনার প্রতিষ্ঠানের হয়তো সরকারী নীতি প্রণয়নের ওপর কোন প্রভাব নেই। নেই বড় ধরণের আর্থিক সামর্থ্যও। কিন্তু সম্ভাব্য অপহরণকারীরা কি তা জানে? অনেক লোকেরই দুঃসংবাদ নিয়ে আসা বার্তা বাহকের ওপরই ঝাল ঝাড়ার একটি প্রবণতা থাকে। অপছন্দের খবর প্রচারের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সাংবাদিককে লক্ষ্যবস্তু করে অপহরণকারীরা ঠিক সেই কাজটিই করে। একজন সাংবাদিক তার নিজের কাজের জন্যও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন, তবে এটি বিরল ঘটনা।

ঝুঁকি নিরূপণের কাজটি শেষ হলে তা হ্রাসের ব্যবস্থা নিন।

ঝুঁকি হ্রাসে সাংবাদিকের যা যা করণীয়

- নিয়মিত ও পূর্ব অনুমানযোগ্য আচরণ পরিহার করা।
- বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে ঝুঁকি নিরূপণ করা।
- গাড়ির দরজা বন্ধ রাখা। রাস্তায় ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
- নিজের গতিবিধি ও পরিকল্পনা সহকর্মীদের অবহিত করা।
- নির্ধারিত সাক্ষাত স্থলে যাওয়ার আগে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা।

অপহরণ সাধারণত হঠাৎই ঘটে থাকে। আপনাকে কী ঘটছে তা দ্রুত বুঝে নিতে হবে। অপহরণকারী যদি সশস্ত্র থাকে তবে আপনার হয়তো যা বলা হবে তা করার কোনো বিকল্প নেই। অপহরণকারীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র না থাকলে আপনি অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করতে পারেন লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। অনেকে জ্ঞান হারানোর ভান করার বুদ্ধি দেন। এতে অপহরণকারীর জন্য আপনাকে ধরে গাড়িতে তোলা কষ্টকর হবে। আকস্মিক আক্রমণে অপহরণকারীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেতে

চায়। চীৎকার করলে মস্তিস্কে অ্যাড্রেনালিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায় যা প্রতিরোধ করাকে সহজতর করে তোলে। অবশ্যই প্রতিরোধে ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু একবার আটকা পড়ে গেলে তো আর ঝুঁকি হ্রাস পায়না।

অপহৃত হলে আপনার আতঙ্ক হবে। পরবর্তী মিনিট, ঘন্টা বা দিনটিতে বেঁচে থাকবেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন না। কিন্তু মনে রাখুন বেশিরভাগ অপহৃত লোকই শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফেরত আসেন। যাদের অপহৃত হওয়ার পর ফিরে আসার অভিজ্ঞতা আছে তাদের পরামর্শ হলো বেঁচে থাকা এবং মধ্যবর্তী সময়ে মনোবল ধরে রাখার জন্য কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে।

আপনার শারিরীক নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে কিন্তু মানসিক নিয়ন্ত্রণ তো নয়। মনকে কিছু সময় শারিরীক ও মানসিক চাপ সহ্য করার জন্য তৈরি করতে হবে। এই চাপ সহ্য করতে হলে একটি ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে। যতদূর পারা যায় আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করুন। আপনার অনুভূতিকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে আচরণ করবেন তার পরিকল্পনা তৈরি করুন। স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদে এই কাজগুলো করতে পারেন আপনিঃ

- অপহরণকারী যাতে নিষ্ঠুর আচরণ না করতে পারে তার চেষ্টা করুন। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারলে হয়তো শারিরীক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন। অপহরণকারীকে আপনার পরিবার সম্পর্কে বলুন। তার কথামতো কাজ করুন। ব্যবহার করুন নম্রভাবে। তাকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না।

- ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করুন। আর সেই সঙ্গে অবস্থার উন্নতি করার সুযোগ খুঁজুন।

- মনে মনে কারো সঙ্গে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন।

- যে পর্যন্ত না সত্যিই মুক্তি পাচ্ছেন সে পর্যন্ত কোনো আশ্বাসে বিশ্বাস করবেন না ।

অপহরণকারীকে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি কোন কারণে তাদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীলও হন, আপনি 'তাদের পক্ষে' নন, তাদের একজন বন্দী মাত্র। আটককারীর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হলে আপনার মূল বক্তব্য এটাই হওয়া উচিত যে, একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি ওই সংঘাতের কোনো পক্ষ নন, তবে সব পক্ষের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রচার করার জন্য সাংবাদিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আপনার কি পালানোর চেষ্টা করা উচিত? অপহরণকারীরা দক্ষ হলে তারা আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। বাইরের কোনো রকমের সাহায্য না পেলে বা বুদ্ধি দিয়ে অপহরণকারীদের বোকা বানাতে না পারলে পালানোর উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পালানোর চেষ্টা করা উচিত কিনা এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে আপনার শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর। শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলে আপনার উচিত হবে সবসময় আটকের স্থানের নিরাপত্তার ফাঁকফোকর খোঁজা। পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ হলে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে। যাহোক, যদি মনে হয় যে, আপনার জীবন

বিপদাপন্ন তাহলে আর কিছু হারাবার নেই। আপনি যে গুরুতর বিপদে আছেন তা বোঝার লক্ষণগুলো হতে পারে এরকমঃ

- অন্য জিম্মিরা (তারা হয়তো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী) মুক্তি পাচ্ছে, কিন্তু আপনার শিগগিরই মুক্তির কোন লক্ষণ নেই।
- পাহারাদার আপনার সঙ্গে অন্যরকম আচরণ শুরু করেছে। আপনার সঙ্গে অন্যদের তুলনায় নিষ্ঠুর আচরণ করছে।
- অপহরণকারী খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং আপনার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে।

জেনেভা কনভেনশন

জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাংবাদিকদের মানবাধিকার এ মর্যাদার ধারণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সাংবাদিকরা বেসামরিক নাগরিক হিসাবে শ্রেণীভূক্ত এবং সহিংসতা, হুমকি, হত্যা, বন্দীদশা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

এই আইনগত বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন চুক্তিগুলো ১৯৪৯ সালে চালু হয়। অধিকাংশ দেশ এটি অনুমোদন করেছে বা মানতে সম্মত হয়েছে। এগুলো আন্তর্জাতিক মানবতা বিষয়ক আইনের অংশ এবং কোনো সৈনিক তা লঙ্ঘন করলে যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত হয়।

সাংবাদিকদের এসব অধিকার সম্পর্কে জানা ও তা প্রয়োগ করা উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি) বলছে যে রাষ্ট্র অবশ্যইঃ

- বন্ধু ও শত্রুর সঙ্গে একইরকম আচরণ করবে
- প্রত্যেক মানুষ, তার সম্মান, পারিবারিক অধিকার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিশুদের বিশেষ অধিকারকে শ্রদ্ধা করবে।
- অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ, জিম্মি করা, হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড, বহিষ্কার করা, লুটতরাজ ও সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করবে।
- আহত যোদ্ধা, যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা দেবে।

জেনেভা কনভেশনের মধ্যে প্রথম দুটিতে যুদ্ধক্ষেত্র ও সমুদ্রে নিয়োজিত আহত ও অসুস্থ সৈনিক এবং চিকিৎসাকর্মে নিয়োজিতদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে তা বলা হয়েছে। তৃতীয় কনভেনশনটি যুদ্ধবন্দী

সংক্রান্ত। তিনটি কনভেনশনেই সাংবাদিক বলতে কেবল অনুমোদিত যুদ্ধ সংবাদদাতাকে বোঝানো হয়েছে।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে শত্রু বা দখলকৃত এলাকায় বেসামরিক নাগরিকদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর্টিকেল ৩ যা সবগুলো কনভেনশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে বলা হয়েছেঃ

বৈরিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে না এবং সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণকারী অথবা অসুস্থতা, আঘাত, বন্দিত্ব বা অন্য কোন কারণে যুদ্ধ করতে অক্ষম সদস্যদের প্রতি সকল পরিস্থিতিতে মানবিক আচরণ করতে হবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা বিশ্বাস, লিঙ্গ, জন্মপরিচয় বা সম্পদ অথবা অনুরূপ কোন বিবেচনায় তাদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্য করা যাবেনা।

যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে ওপরে বর্ণিত লোকদের প্রতি নিম্নোক্ত আচরণগুলো করা যাবে নাঃ

ক) জীবন ও মানুষের প্রতি সংহিসতা, বিশেষ করে সব ধরনের হত্যা, অঙ্গচ্ছেদ, নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্যাতন।

খ) জিম্মি করা।

গ) ব্যক্তির মর্যাদা হরণ, বিশেষ করে অপমানজনক ও অবমাননাকর আচরণ।

ঘ) অভিযুক্তকে সকল অপরিহার্য আইনী সুরক্ষা না দিয়ে বৈধ আদালতের পূর্ববর্তী রায় ছাড়াই সাজা প্রদান ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

ঙ) আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৭৮ সালে কার্যকর হওয়া জেনেভা কনভেনশনের প্রটোকল ১ এর আর্টিকেল ৭৯ এ বলা হয়েছেঃ

১. সশস্ত্র সংঘাত চলছে এমন এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের বেসামরিক নাগরিক হিসাবে গণ্য করতে হবে।

২. সাংবাদিকরা জেনেভা কনভেনশন এবং এই প্রটোকলের আওতায় সুরক্ষা পাবেন। তবে এই শর্তে যে, তারা এমন কিছু করবেন না যা তাদের বেসামরিক নাগরিকের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করবে।

৩. প্রটোকলের সঙ্গে সংযুক্ত মডেলের মতো একটি পরিচয় পত্র যোগাড় করতে হবে সাংবাদিককে। সাংবাদিক যে রাষ্ট্রের নাগরিক বা যে অঞ্চলের বাসিন্দা, কিংবা তার প্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত সেখানকার সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাকে সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এ কার্ড দেবে।

জেনেভা কনভেনশন গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও দাঙ্গা ও গণ অসন্তোষ এর আওতায় পড়ে না।

প্রটোকল ২ একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সেদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্রোহী বাহিনী বা সংগঠিত অন্য সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ প্রটোকল দেশের অভ্যন্তরে বড় ধরণের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেও কনভেনশনের আওতাভুক্ত করে। তবে এটি সুনির্দিষ্টভাবে দাঙ্গা, বিক্ষিপ্ত সহিংসতা ও এ ধরনের অন্য কর্মকাণ্ডকে কনভেনশনের বাইরে রেখেছে কারণ এগুলো 'সশস্ত্র সংঘাত' নয়।

বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি কী আচরণ করা যাবে, কী করা যাবে না

প্রটোকল ২ এর অনুচ্ছেদ ৪ এ বেসামরিক জনগণের প্রতি বিবদমান পক্ষগুলোর মানবিক আচরণের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে।

১. বৈরিতায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি বা করা থেকে বিরত হয়েছেন এমন সব লোকেরই (তাদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হোক বা না হোক) তাদের ব্যক্তিগত জীবন, মর্যাদা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার পালনের অধিকার রক্ষা করতে হবে। সকল পরিস্থিতিতে কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না এমন আদেশ দেওয়া যাবে না।

২. ওপরে বর্ণিত লোকজনের সঙ্গে যে কোনো সময় বা যে কোনো স্থানে এই কাজগুলো করা নিষিদ্ধ:

ক. ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য এবং শারীরিক অথবা ও মানসিক সুস্থাবস্থার বিরুদ্ধে সংহিসতা। বিশেষ করে খুন এবং নির্যাতন, অঙ্গছেদন বা কোন শারিরীক শাস্তির মতো কোনো নিষ্ঠুর আচরণ।

খ. যৌথ শাস্তি প্রদান।

গ. জিম্মি করা।

ঘ. সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড।

ঙ. ব্যক্তি মর্যাদা লংঘন,বিশেষ করে অপমানজনক ও অবমাননাকর আচরণ, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা ও যে কোনো ধরণের অশোভন আচরণ।

চ. দাসপ্রথা ও সব ধরণের কায়দায় দাস ব্যবসা।

ছ. লুটতরাজ।

জ. কারো বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত যে কোনো কাজ করার ব্যাপারে হুমকি দেওয়া।

অধ্যায় ৩

দাঙ্গা ও গণ অসন্তোষ

দাঙ্গা, সহিংস গোলযোগ এবং এমনকি আপনার নিজের নগরকেন্দ্রে বিক্ষোভও যুদ্ধক্ষেত্রের মতই সমান বিপদজনক হতে পারে। কিছু ঘটনা আছে যা আগে থেকে অনুমান করা যায় না। বিপদ থাকতে পারে গোপনে ওঁৎ পেতে। চোখের পলকে পরিস্থিতির তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে। অহিংস জনতাও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে যদি তারা কোনো কারণে আতঙ্কিত হয় বা ক্ষেপে যায়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সহসাই বিপদজনক দাঙ্গার রূপ নিতে পারে।

যেখানে জাতিগত সংঘাত চলছে অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বিভক্তি সেখানে সাংবাদিকদের নিরাপদ এবং অনিরাপদ এলাকা চিনতে হবে। কী ধরণের আচরণ করা নিরাপদ এবং কোনটিই বা বিপজ্জনক সেটাও জানা থাকা চাই।

সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রায়ই অসামরিক লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করে। কিছু কিছু দেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। ক্যামেরা ক্রু, সংবাদদাতা এবং ফটোসাংবাদিকরা যারা সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা কাভার করেন তাদের প্রতিহিংসার ঝুঁকি সম্পর্কে অথবা ঘটনার অব্যবহিত পরই দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই সব পরিস্থিতিতে একজন সাংবাদিকের লক্ষ্য হবে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত সাংবাদিকের মতোই- ন্যূনতম ঝুঁকিতে ভাল সংবাদ সংগ্রহ করা। আগে থেকে পরিকল্পনা করা এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একই নীতি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ওই সাংবাদিকদের যাদের কিনা এমন স্থানে পাঠানো হয়েছে যার নিরাপদ ও অনিরাপদ জায়গাগুলো তারা চেনেন না। জানেন না আগে বিদ্যমান ঝুঁকির ধরণটি কেমন ছিল বা হামলার মাত্রা কতোটা হতে পারে। সংঘাতে জড়িত কোনো পক্ষ যদি একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে কোনো এক পক্ষের সমর্থক মনে করে তবে সে প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। সাংবাদিকরা এজন্য হয়তো তাদের প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে পারে এরকম স্টিকার অথবা লোগো খুলে রাখার বিষয়টি ভেবে দেখলে ভালো করবেন।

নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ অনেক সময়ই দাবি করে ক্যামেরার উপস্থিতি দাঙ্গার সূত্রপাতে উৎসাহ দেয় বা তা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং তারা তাদের কার্যকলাপের ছবি তোলায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্যামেরায় তোলা ছবি তাদের সহিংসতা সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করবে এরকম মনে করলে দাঙ্গাকারী অথবা নিরাপত্তা বাহিনী উভয়েই সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। দাঙ্গাকারীরা যদি মনে করে ফিল্ম পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হবে তাহলে ফটোসাংবাদিক এবং টিভির ক্যামেরাম্যানদের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

নিরাপদ থাকার কৌশল

- প্রেস আই ডি সঙ্গে রাখুন। কিন্তু যখন নিরাপদ কেবল তখনই তা দেখান।

- মোবাইলের 'দ্রুত ডায়ালে' একটি ইমার্জেন্সি নাম্বার সেট করে রাখুন।

- টিয়ার গ্যাস ছোড়া হলে বাতাসের বিপরীত দিকে অবস্থান নিন। গ্যাস থেকে বাঁচতে ভেজা তোয়ালে, পানি ও কিছু লেবুজাতীয় ফল সঙ্গে রাখুন।
- গগল্‌স ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হলে নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার করুন।
- প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সঙ্গে রাখুন এবং তার ব্যবহার শিখে নিন।
- প্রাকৃতিক তন্তুর তৈরি ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।
- বাহু, পা ও ঘাড় আবৃত রাখুন।
- এক দিনের খাবার ও পানি বহন করুন।

ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষ ক্যামেরাবন্দী ও চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে ব্যালাক্লাভা (মুখের অনেকখানি ঢাকা টুপি) অথবা মোটর সাইকেলের হেলমেট ব্যবহার করে তাদের মুখ ঢেকে রাখতে পারেন। বিশেষ পুলিশ অথবা সেনাসদস্যরাও দাঙ্গা মোকাবেলার সময় হেলমেট ও মুখোশ পরতে পারেন এবং পরিচয় গোপনের জন্য সনাক্তকরণ নম্বর খুলে রাখতে পারেন। এটা প্রমাণিত বিষয় যে, চিহ্নিত হওয়ার ভয় না থাকলে লোকের কাজের ব্যাপারে জবাবদিহিতা কমে যায় এবং বেশি সহিংস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

একদল লোকের মধ্যে ক্রোধের কারণে সহিংসতা শুরু হতে পারে। কখনো পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গেলে তা হতে পারে । কোন পক্ষই আগে থেকে সতর্ক করবে সে সম্ভাবনা কম। নিরাপত্তাবাহিনী দ্রুতই লাঠি ও ঢাল থেকে টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট এমনকি গুলির আশ্রয় নিতে পারে। অনেক লোকের ভিড়ে আটকা পড়লে দ্রুত সহকর্মীদের কাছে বা নিরাপদ স্থানে যাওয়া কঠিন হবে।

দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে.... .নিঃশ্বাস নেওয়াও কঠিন হয়ে উঠলো

ভারতের রাম রাম গোপাল ২০০২ সালের মার্চ মাসে আহমেদাবাদে দাঙ্গার সময় একটি টেলিভিশন প্রতিবেদক দলের প্রযোজক ছিলেন। সেবার সমস্যার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকায় মূল্যবান শিক্ষা হয়েছিল তার।

"রাত সাড়ে দশটায় একটি ফোন পেয়ে জানলাম গোমতীপুরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের চারজন - ক্যামেরা, প্রযোজক, সংবাদদাতা ও রেকর্ডিং- বর্ম আর সেনাবাহিনীর মত হেলমেট পরে গাড়িতে উঠলাম। পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স সেখানে ছিল।

"পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের কাছাকাছি একটি ছোট জায়গার মাঝখানে আমরা অবস্থান নিলাম। আশেপাশে ছিল বেশ কিছু গলি। যতক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম ততক্ষণ আমরা বেশ নিরাপদই বোধ

করছিলাম। দাঙ্গা চলছিল আমাদের সামনের দিকে। পেছনে ছিল একটা চত্বর। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়তে থাকলেই শুরু হলো সমস্যা। ক্রমশঃ শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠলো।

"আমরা আমাদের তোয়ালে ও পানি গাড়িতে রেখে এসেছিলাম। অন্যদের বললাম, আমি এক কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়ে তোয়ালে আর পানি নিয়ে আসবো। কোনো আলো ছিলনা । ৫০ মিটার পর পরই ছিল পুলিশের চৌকি। এলাকায় পুলিশের প্যাট্রোল কার ছিল কিন্তু পাথর বৃষ্টির মুখে এক সময় কেটে পড়ল তারা। ....আমি বুঝলাম যে খুব ধীরে চলছি। তাই গাড়ি থেকে বের হয়ে দিলাম দৌড়। হঠাৎ একটি পাথর এসে লাগলো গায়ে।

"ঢিলটি লেগে আমার শরীর সামান্য কেটে গেল। আঘাতের জায়গাটি একটু ফুলেও উঠল। আমি গাড়িচালককে ভেতরে যেতে বললাম। কিন্তু সে রাজি হচ্ছিল না। তখন সেখানে এসিড ভরা বোতল ছোড়া হচ্ছিল। পরে আমরা গাড়ির ভেতর গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

"সেই সময়ের কথা মনে করলে এখন বুঝি আমাদের সবারই মেডিক্যাল কিট সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। টিয়ারগ্যাস মোকাবেলা করার জন্য পানি সঙ্গেই রাখা উচিত ছিল যাতে দল থেকে পৃথক হওয়ার প্রয়োজন হতো না। আমাদের সঙ্গের রিপোর্টারটির তো প্রায় বমিই করার অবস্থা হয়েছিল।

"এ ঘটনার অল্পদিন আগেই প্রথম বাবা হয়েছিলাম আমি। নতুন পিতা হিসাবে আমি চিন্তা করছিলাম, এর কি দরকার ছিল? "

বিক্ষোভের মত পরিকল্পিত ঘটনা কাভার করার সময় জনতার সম্ভাব্য গতিবিধি, সম্ভাব্য বিপজ্জনক জায়গা ও নিরাপদে সরে যাওয়ার বিকল্প পথ সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজ করে রাখুন। খবর সংগ্রহের জন্য সুবিধাজনক স্থান ও বের হয়ে আসার বিকল্প পথ নির্বাচন করতে আগেই স্থানটি পরিদর্শন করুন। কোন এলাকায় কোন জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন থাকে এটা জানা থাকলে হয়তো আপনি এর ভিত্তিতেই আপনার ওই এলাকায় যাওয়া ও বেরিয়ে আসার রুট ঠিক করবেন।

দল থেকে কাউকে আলাদা হতে হলে পরে যোগাযোগের স্থান ও সময় আগেই ঠিক করুন। সরাসরি যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করুন। পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন। তবে যদি মনে হয় যে এটা অনাবশ্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাহলে বরং তা গোপন রাখাই ভালো হবে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য মোবাইলে গুরুত্বপূর্ণ নম্বরে দ্রুত ডায়ালের সুবিধা সেট করে রাখুন।

যদি টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে তাহলে বাতাসের বিপরীত দিকে থাকার চেষ্টা করুন। মুখ ঢেকে রাখার জন্য সঙ্গে ভেজা তোয়ালে ও পানি রাখা দরকার। গ্যাস মুখোশ বহন করা সম্ভব না হলে চোখে লেবু জাতীয় ফলের রস মাখুন যা যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করবে। চোখের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। সাঁতারের চশমা বা কারখানার কাজে ব্যবহারের গগল্‌স হলেই চলবে।

মলোটভ ককটেল থেকে শরীরে যদি পেট্রল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। সংঘাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যুদ্ধাঞ্চলের মতই সুরক্ষামূলক পোষাক পরুন।

প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সঙ্গে রাখুন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় শিখে নিন।

ঢিলেঢালা প্রাকৃতিক সুতার পোষাক পরুন যাতে কৃত্রিম তন্তুর পোষাকের মত দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়বে না। পুরো হাতা ও উঁচু কলারের জামা এবং লম্বা ট্রাউজার পরতে হবে। এটি টিয়ার গ্যাস থেকে আপনার শরীরকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করবে।

পিঠের ঝোলা ব্যাগে অন্তত এক দিনের প্রয়োজন মতো খাবার, পানি ও অন্যান্য জিনিষ রাখুন। গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ায় আপনি যদি অফিসে ফিরে যেতে ব্যর্থ হন তবে এগুলো কাজে লাগবে।

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা

জরুরি অবস্থায় কাজ চালানো 'ছুরিকাঘাত বর্ম' হিসেবে শার্ট বা জাম্পারের নিচে একটা ম্যাগাজিন অথবা খবরের কাগজ ঢুকিয়ে রাখা যায়। একটি শক্ত টুপি আপনার মাথাকে রক্ষা করতে পারে।

অবস্থান গ্রহণ

চিন্তা করুন ক্যামেরা ও সাংবাদিকদের কীভাবে বসালে ঘটনার একটি সার্বিক দৃশ্য পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান হলে বেশি ভালো হবে। এলাকা ত্যাগের জন্য একাধিক পথ থাকা উচিত। আপনি যদি ক্যামেরায় থাকেন তাহলে জনতার মধ্যে ঢুকে অ্যাকশনের বেশি কাছে যাওয়াটা অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। তবে প্রতিবেদক হলে এবং ছবি তোলার প্রয়োজন না থাকলে আপনার ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। ঘটনাস্থল পর্যন্ত পরিষ্কার দৃষ্টি গেলে আর শব্দ বোঝা গেলেই চলবে। ঘটনার আগে বা পরেও অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার নেওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনা চলাকালে ঠিক কী হচ্ছে তার সার্বিক চিত্র পেতে সেদিকেই খেয়াল রাখা দরকার।

ঘটনার সময়

আপনি যদি একটি টিমের সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে একসঙ্গে থাকুন। এক সঙ্গে কাজ করুন আবার একসঙ্গেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করুন। বেশি দেরি না করে বরং আগেই সরে আসায় দোষ নেই। আর যদি একা কাজ করেন প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন এমন কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারটি নিশ্চিত করুন। আপনার ফোনের "শেষ নম্বর রিডায়াল"-এ এমন কোনো নাম্বার সেট করে রাখুন যা থেকে তাৎক্ষণিক সাহায্য মিলবে।

ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রধান পথ, উল্লেখযোগ্য স্থান, নিরাপত্তাবাহিনী বা হাসপাতালের অবস্থান মনে রাখার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে ভেবে দেখুন সেগুলো ঠিকঠাক মনে আছে কিনা।

ক্যামেরার ফিল্ম বা ফ্ল্যাশ কার্ড নিয়ে নেওয়া হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে একটি ডামি ফ্ল্যাশ কার্ড,

ব্যবহৃত ফিল্ম বা টেপ সঙ্গে রাখুন এবং নিজের সদ্য ব্যবহৃত ফ্ল্যাশ কার্ড অথবা ফিল্ম ক্যামেরা থেকে বের করার পরই দ্রুত লুকিয়ে ফেলুন। বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আরেকজন ফটো সাংবাদিকের সঙ্গে মিলে কাজ করুন যাতে একে অপরের ওপর নজর রাখতে পারেন। আপনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন কিন্তু আপনারা সহকর্মীও বটে।

সাংবাদিক বা ফটোসাংবাদিক যা-ই হোন না কেন, যদি একা কাজ করেন, তবে আপনি নিজেই জনতার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছেন কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। জনতা বৈরীভাবাপন্ন না হলেও আপনার জন্য ঝুঁকি থাকতে পারে। সহকর্মীদের কেউ আপনাকে দেখিয়েছে এমন ছবি নিজেও তুলতে গিয়ে অযৌক্তিক ঝুঁকি নেবেন না।

ঘটনার পর

সংবাদকক্ষে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন যাতে ভবিষ্যতে তা অন্যদের কাজে লাগে। ফিল্ম বা টেপের মতো সংবাদ সরঞ্জামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। ফ্ল্যাশ কার্ড, ফিল্ম বা ভিডিও উপাদান দাবি করার ব্যাপারে নিরাপত্তা বাহিনীর অধিকার সম্পর্কে আপনার দেশের আইন কী বলে ?

যে অঞ্চল বা দেশে কাজ করছেন সেখানে সাংবাদিক হিসেবে নিজের জন্য প্রযোজ্য আইনী দিকগুলো জানা থাকতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠানের নীতিই বা কী?

যদি সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে ছবির মতো সংবাদ উপাদান রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে কি ছবি দ্রুত ওই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ? মনে রাখুন বিক্ষোভ ও গণরোষের পর ছবি বা এ জাতীয় সংবাদ উপাদান পুলিশের হাতে দিলে আপনার নিরাপদে দায়িত্বপালন ব্যাহত হতে পারে। দাঙ্গায় অংশ নেওয়া লোকজন যদি আপনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখে তাহলে কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বেন।

সন্ত্রাসবাদী হামলা

সাংবাদিকরা বেসামরিক নাগরিকদের মতই একইরকম সন্ত্রাসী আক্রমণের ঝুঁকির মুখে থাকেন। তবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকরা বোমা ও গুলির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলে এই ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। হত্যা ও বোমাবর্ষণের ঘটনাস্থলে যাওয়াটাও ঝুঁকির ব্যাপার।

ক্ষুদ্ধ জনতা ফটোসাংবাদিক এবং ক্যামেরা অপারেটরদের ওপর চড়াও হতে পারে কারণ তাদের ধারণা হতে পারে সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে উদাসীন। হামলাকারীদের মিডিয়ায় প্রচার পাওয়া ঠেকানোও হতে পারে জনতার সাংবাদিকদের হামলা করার অন্যতম কারণ।

কখনও পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালানোর জন্য প্রথমে একটি ছোট ঘটনা ঘটানো হয়। এর উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করা। অ্যাম্বুলেন্স বা দমকল বাহিনীর মতো জরুরি সার্ভিসের কর্মীরা যাতে ঘটনাস্থলে যায় সেজন্য প্রথমে একটি বোমা ফাটানো হতে পারে। এর পর ঘটানো হতে পারে একটি বড় আকারের বোমার বিস্ফোরণ।

বিভিন্ন টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা তাদের ক্যামেরা মাটিতে রেখে ছবি তুলছেন। হরতাল চলাকালে রাসেল স্কয়ার থেকে তোলা ছবি। (ঢাকা, ২০০৬)
ফটো: আবির আব্দুল্লাহ

SHANTI
SONY

নিরাপত্তা কর্ডনের ভেতরে দায়িত্বপালনরত পুলিশ কর্মকর্তা, চিকিৎসাকর্মী অথবা সাংবাদিকরা দ্বিতীয় দফা বোমা হামলায় হতাহত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।

উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা তুলে ধরা যাক। ফ্রি ল্যান্স ফটোগ্রাফার হুয়ান কাস্তিলো ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে মেক্সিকো সিটিতে একটি বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের সময় আঘাত পান এবং দাঙ্গা পুলিশ তার ক্যামেরা ও সরঞ্জাম কেড়ে নেয়। স্থানীয় ছাত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন চলাকালে গ্রেপ্তারকৃত বিক্ষোভকারীদের মুক্তি দাবি করছিল সেখানে।

ছাত্র-জনতা ব্যাপকভাবে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করায় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। কমপক্ষে তিনজন আলোকচিত্রী ইটের আঘাতে অথবা পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হন। পুলিশ ৪০ জনকে আটক করে।

আমার চারদিকে সবকিছু থেমে গিয়েছিল.. ..তারপর হঠাৎ করে দশ মিটার দূরেই বিস্ফোরিত হল গাড়িটি

দিল্লীভিত্তিক ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক সুহাসিনী হায়দার সি এন এন এর হয়ে কাজ করছিলেন। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীরে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার একদিন পর শ্রীনগর গিয়েছিলেন তিনি।

"আমার গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় প্রচণ্ড একটি শব্দ শুনতে পেলাম। ড্রাইভারকে বললাম, শব্দের উৎসের দিকে যেতে। একটু পরই আমরা একটি বড় বিপনী এলাকার পাশের সরু লেনে এসে পড়লাম। কেউ একটি গাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছিল। আরো চারজন সাংবাদিক ছিলেন সেখানে। ধীরে ধীরে পুলিশ আসতে লাগল। সেনাবাহিনীর বোমা স্কোয়াডও এলো। গাড়িটির দরজা লক করা ছিল না যা সন্দেহজনক। তবে আমরা ভেবেছিলাম বিপদ কেটে গেছে। পুলিশ আমাদের গাড়িটি থেকে প্রায় ২০ মিটার দূরে সরিয়ে দিল।

"আমি অন্য সাংবাদিকের সঙ্গে পুলিশের কাছে গিয়ে তাদের মন্তব্য জানার চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছিল চারপাশে সবকিছু থমকে গেছে। কোনো শব্দ নেই এমন একটি অবস্থা। তো, আমি শুধু কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছি মাত্র আর ১০ মিটার সামনে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল গাড়িটি।

"একজন পুলিশ আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে বলল,' বসে থাকুন'। আবার চারদিক নীরব। হঠাৎ ছুটে এলো অসংখ্য কাচের টুকরা আর প্রচণ্ড তাপ। আমি আমার ডান দিকের লোকটিকে পড়ে যেতে দেখলাম।

"ওই ঘটনায় ১৯ জন নিহত হয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চারদিক। এর অনেক কিছুই আমার স্পষ্ট মনে নেই।

"এর পরই আমরা গুলির শব্দ শুনলাম আর পুলিশও এলোপাতাড়ি গুলি চালানো শুরু করে দিল। আমি ও

স্ট্রিঙ্গার উঠে দাঁড়ালাম। তখনি বুঝলাম যে আহত হয়েছি। আমি বাহুতে ভর দিয়ে উঠতে পারছিলাম না। মাথারও কয়েক স্থানে কেটে গিয়েছিল। ক্যামেরাম্যানকে বললাম আমি চিকিৎসা নিতে যাচ্ছি। কাছের একটি সেনা ঘাটিতে গেলে সেখানে আমার চিকিৎসা করা হলো। আমার এক বাহুর হাড় জোড়া থেকে মারাত্মকভাবে সরে গিয়েছিল।

"এরকম ক্ষেত্রে আপনাকে আগে থেকেই তৈরি থাকতে হবে। দ্বিতীয় দফা বোমা হামলা প্রায়ই ঘটে থাকে। প্রথমটির পর পুলিশ ও জনতা ঘটনাস্থলে যায়। এরপর দ্বিতীয়টি বিস্ফোরিত হয়। আমার উচিত ছিল গাড়িটি থেকে আরো দূরে থাকা। পুলিশ সরিয়ে না দিলে নির্ঘাত মারা যেতাম।

"আমি এখন অনেক সতর্ক। পার্ক করা গাড়ি দেখলে একটু চিন্তাই হয়। বিপজ্জনক জায়গায় আমি যাই ঠিকই, কিন্তু সেটা যদি কাজের জন্য হয়। এমনটা নয় যে ওরকম যায়গায় যেতে আমার ভালো লাগে।

"বোমা হামলা কখন হবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায় না।"

অধ্যায় ৪

জরুরি চিকিৎসা সেবা ও স্নায়বিক চাপ মোকাবেলা

কোনো সাংবাদিক তাদের নিয়মিত কর্মস্থল থেকে দূরে কোথাও কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কাজ করলে একজন সহকর্মীর অসুস্থতা কিংবা আহত হওয়ার ঘটনায় কখন এবং কীভাবে তাকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হবে তা তাদের জানা প্রয়োজন। সংঘাতময় পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার পরিবর্তে বরং জরুরি চিকিৎসার বেশি প্রয়োজন হতে পারে যার কায়দা সাংবাদিকদের জানতে হবে।

একজন রোগী কিংবা জখম ব্যক্তিকে হাসপাতাল অথবা ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার আগে হাতের কাছে যে চিকিৎসা সুবিধা থাকে সাময়িকভাবে সেটা দেওয়ার ধারণাটিই হলো প্রাথমিক চিকিৎসা। কিন্তু বৈরী পরিবেশে একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে পেতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময়ও লেগে যেতে পারে। তাই এ সময় আহত বা অসুস্থ সাংবাদিককে জরুরি চিকিৎসা ও সেবা দিতে হবে যাতে তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ একজন প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল কর্মীর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার আগে পর্যন্ত আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যাতে স্থিতিশীল থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ দক্ষতা অর্জনের জন্য সাংবাদিককে সাধারণ ম্যানুয়ালে যা থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড) কিংবা জরুরি চিকিৎসা কোর্সের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক জখমে স্প্লিন্ট স্থাপন , ব্যান্ডেজ বাঁধা, ক্ষতস্থান পরিস্কার ও রক্তপাত বন্ধ এবং চেতনা ফিরিয়ে আনার মতো বিষয় শিখতে পারেন।

আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্যই অন্য সব সাংবাদিকও যাতে এটি শেখেন সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তাই কেবল নিজে শেখার ওপর জোর দিলে চলবে না, বরং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সব সাংবাদিককেই যাতে মেডিকেল এইড এবং রিফ্রেশার কোর্স করতে পাঠানো হয় তার তাগিদ দিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা যতো বেশি সাংবাদিক জানবেন ততোই ভালো। একই সঙ্গে কাউকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আপনার সামর্থ্য নির্ভর করবে সঙ্গে যেসব মেডিকেল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রয়েছে তার গুণগতমানের ওপর। ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে উন্নতমানের মেডিকেল সরঞ্জাম বহন করা এবং তার ব্যবহার জানা উচিৎ। স্প্লিন্ট কিংবা স্ট্রেচার না থাকলে কীভাবে বিকল্প উপায়ে কাজ চালানো যায় তা-ও সাংবাদিকদের জানতে হবে।

কোনো একটি বৈরী এলাকায় একজন সাংবাদিক সবচেয়ে বেশি যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন তা হলো- অসুস্থতা, খাদ্যে বিষক্রিয়া কিংবা জলবায়ুগত সমস্যা। কোনো নতুন অঞ্চলে অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সে এলাকার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে, সে এলাকার সবচেয়ে বেশি সংক্রামক রোগ বা পোকামাকড়ের কামড়, পানি বা খাদ্যের মাধ্যমে ছড়াতে পারে এমন অসুখের বিষয়ে ধারণা নিয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে বেশি ঘটে এমন অসুস্থতার জন্য সঠিক ওষুধটিও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

বিভিন্ন দেশে রেডক্রস বা রেডক্রিসেন্টের স্থানীয় ইউনিটগুলো আগ্রহীদের বিনা খরচে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জরুরি চিকিৎসার কোর্স করিয়ে থাকে। যথাযথ প্রচারণার মাধ্যমে এ ধরনের কোর্সকে সাংবাদিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম ক্রিকেট মাঠে আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পুলিশ সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ চালায়। হামলায় অন্যান্যের সঙ্গে আহত হন দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকার একজন স্থানীয় সাংবাদিক।
ফটো: মীর ফরিদ

জরুরি চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্সে কমপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে হবে:

- গুলি বা ভয়াবহ বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতাজনিত গুরুতর মানসিক আঘাত
- প্রচুর রক্তক্ষরণ
- হাড় ভেঙে যাওয়া
- অগ্নিদগ্ধ হওয়া

মানসিক আঘাত-পরবর্তী চাপ মোকাবেলা

খুব বীভৎস ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এমন মানুষের ওপর অনিবার্যভাবেই সেসব ঘটনার কিছু প্রভাব পড়ে। সাংবাদিকদের এমন অনেক সংঘাতের ঘটনার রিপোর্ট করতে বা ছবি তুলতে হয় যেখানে মানুষ হতাহত হয়, কিন্তু আক্রান্তদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করেন তারা। একজন মানুষকে সন্ত্রাসের শিকার, আহত কিংবা নিহত হতে দেখলে কেউই নিস্পৃহ থাকতে পারে না।

এছাড়াও, সাংবাদিকরা অনেক সময় নিজেরাই ঝুঁকির সম্মুখীন এবং ভীতসন্ত্রস্ত হতে পারেন। তবে বেশিরভাগ সাংবাদিকই এই সমস্যা কোনো না কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। তবে অনেকের

মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য এক ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যেমন বিপদের ব্যাপারে অতিরিক্ত ভয় বা আকস্মিক শব্দে চমকে ওঠা। কেউবা সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেন এবং মৃত্যু ও মানুষের দুর্ভোগের ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে ওঠেন। কেউ আবার এই মানসিক চাপ দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ান যা তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

যুদ্ধ ও সংঘাতের খবর সংগ্রহে নিয়োজিত সাংবাদিকরা এর ভয়াবহতা থেকে নিজেদের কিছুটা রক্ষা করতে পারেন এ কথা ভেবে যে, আবেগপ্রবণ না হয়ে পেশাগত দায়িত্বের বিষয়টিকে আগে স্থান দিতে হবে। আবার অনেকে নিজস্ব পারদর্শিতা দিয়ে এ সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। তবে তাদেরকে যুদ্ধ বা সংঘাতের ভয়াবহতা তুলে ধরায় ঢিলেমি দিলে চলবে না।

ফটোগ্রাফার এবং ক্যামেরা অপারেটররা ভয়ার্ত মানুষ কিংবা মৃত বা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এমন মানুষের ছবি তোলার সবচেয়ে ভালো অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে অনেক সময় ব্যয় করে থাকেন। যুদ্ধ ও সংঘাতের খবর সংগ্রহে নিয়োজিত সাংবাদিকদের ওপর এর প্রভাব কমবেশি পড়বেই। যারা সড়ক দুর্ঘটনা, বীভৎস হত্যাকাণ্ড কিংবা হত্যা মামলার দীর্ঘ বিচারের রিপোর্ট করেন তাদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। যেসব সাংবাদিক সংঘাত নিজের এলাকায় হওয়ার কারণে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না, তাদের ওপর এর প্রভাব পরার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

পুলিশ বা দমকল বাহিনীর কর্মীদের জন্য অনেক আগে থেকেই এ ব্যাপারে একটি সাপোর্ট নেটওয়ার্ক থাকলেও অনেকগুলো কারণে সাংবাদিকদের জন্য মানসিক আঘাতের মতো ঘটনা মোকাবেলা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অনেক সময়ই সাংবাদিকদের মধ্যে এক ধরণের বাহাদুরি দেখানোর মনোভাব কাজ করে যাতে তারা নিজেদের যে কোনো ধরণের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম বলে মনে করেন। তারা আরো মনে করেন ব্যক্তিগত অনুভুতি পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়।

সাংবাদিকরা তাদের মনোযোগ সংঘাতের শিকার লোকজন থেকে সরিয়ে নিজেদের ওপর নিবদ্ধ করতে চান না। সাংবাদিক ও ক্যামেরা অপারেটররা যা ঘটছে তা-ই তুলে ধরতে ব্যস্ত থাকেন, তারা নিজেদের খবরের অংশ হয়ে ওঠা বা ঘটনার শিকার হিসেবে দেখতে চান না।

ঘটনা শেষ হলেও সমস্যা থেকেই যায়

সাংবাদিকসহ ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এমন অন্য সবার ওপরই অনিবার্যভাবেই সেসব ঘটনার কিছুটা প্রভাব পড়ে।

অনেকের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য এক ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে যা কেটে যায়।

অনেকের আরো বেশি সাহায্য প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে যারা অসহায়ত্ব বোধ ও ভয়কে চেপে রাখতে বাধ্য হন।

ফটোসাংবাদিকরা ঢাকার জিরো পয়েন্টের চুড়ায় উঠে ছবি তুলছে। গণবিক্ষোভ ও রাজনৈকিক সমাবেশের সময় ফটোসাংবাদিকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায়শঃ কাজ করতে হয়। (জানুয়ারী, ২০০৫, ঢাকা)
ফটো: আজিজুর রহীম পিউ/দৃকনিউজ

দিনাজপুর
রংপুর
রাজশাহী
বগুড়া
কি:মি:
খুলনা -৩৩৫
যশোহর -২৭৪
কুষ্টিয়া -২৭৭
ফরিদপুর
সুরেশ্বর
উরস শরীফ

যুদ্ধ ও সংঘাতের ওপর রিপোর্ট করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সাংবাদিকদের প্রায় এক চতুর্থাংশই পরবর্তীকালে 'পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগে থাকেন।

বাহাদুরি দেখানোর যে প্রবণতা থেকে সাংবাদিকরা একাই সব কিছু সামলাতে চান সে মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে।

কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফেরার পর সাংবাদিককে অবশ্যই তার অভিজ্ঞতা অন্যদের জানাতে হবে।

সাংবাদিকের জন্য স্বেচ্ছায় অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

পিটিএসডি-র লক্ষণ দেখা দিলে সাংবাদিকদের সহজে চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবশ্যই আশ্বস্ত হতে হবে যে, তারা চাকরি, সুযোগ-সুবিধা কিংবা সম্মান হারাবেন না।

স্থানীয় ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকরা সহযোগিতা না পাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।

যুদ্ধ ও সংঘাতের ঘটনা কাভার করেন এমন বেশিরভাগ সাংবাদিকই অবশ্য পিটিএসডি-তে ভোগেন না। তবে কম-বেশি নানা সমস্যায় সবাই ভোগেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে কোনো বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফেরার পর অবশ্যই একজন সাংবাদিককে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে উৎসাহিত করা। সাংবাদিকদের আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে, বিষণ্নতা বা দুঃখবোধের কথা প্রকাশ করা দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ নয়। এসব অনুভূতি মানবদেহের স্বাভাবিক মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

আঘাত-পরবর্তী এই স্নায়বিক চাপ কাটিয়ে ওঠার উপায় একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম। কেউ কেউ হয়তো এ ব্যাপারে পরিবারের সদস্য কিংবা কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অনেকে আবার কেবল তাদের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা করতে স্বস্তি বোধ করেন যারা নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন।

বিবিসির বিনামূল্যে এক্সটার্নাল কাউন্সেলিং স্কিমের মতো বিভিন্ন উপায়েও সাংবাদিকদের সহযোগিতা দেওয়া যেতে পারে। তবে এমন নজির আছে যে, ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে এমন আশঙ্কায় অনেক সাংবাদিক এ ধরণের কাউন্সেলিং গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সাংবাদিকদের এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, কাউন্সেলিংয়ের সময় বিষণ্নতা বা দুঃস্বপ্নের কথা স্বীকার করলে তারা চাকরি হারাবেন না বা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট থেকে বঞ্চিত হবেন না কিংবা সম্মানহানিও হবে না। তাই সাংবাদিকদের কাউন্সেলিং হবে একটি গোপনীয় ব্যাপার। এই কাউন্সেলিং গ্রহণের জন্য তাকে যেন অফিসের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে যেতে না হয় এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

তবে সাংবাদিকদের এ সমস্যায় ভোগার বিষয়টি যখন বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন সরাসরি সেবা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সহকর্মীর মধ্যে পিটিএসডির লক্ষণ আছে কী না তা সনাক্ত করা শিখতে হবে সাংবাদিকদের। এতে করে তারা একে অপরকে সহায়তা ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিতে পারবেন। সাংবাদিকরা যাতে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ নিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে 'সেলফ হেল্প গ্রুপ' প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে যেখানে সংঘাত কাভার করে এসেছেন এমন সাংবাদিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে হালকা বোধ করতে পারেন। এসব গ্রুপের সদস্যদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এখানে যা বলা হবে তা বাইরের আড্ডার খোরাকে পরিণত হবে না।

দেখা গেছে যে, যুদ্ধ-সংঘাতের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে কাভার করার ফলে একজন সাংবাদিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে পারেন। নিয়োগকর্তাদের মনে রাখতে হবে, গুলিতে আহত একজন সাংবাদিকের চিকিৎসা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন সাংবাদিকের চিকিৎসার বিষয়টিকে একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের। ফ্রিল্যান্স এবং স্ট্রিংগাররাও যাতে নিয়মিত কর্মীদের মতোই কাউন্সেলিং ও চিকিৎসাসেবা পেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকরাও যেন কোনো বৃহৎ মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত কাউন্সেলিং সুবিধা বিনা খরচে পেতে পারে। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে অথবা সাংবাদিক সংগঠনগুলো নিজেরা মিলে এর ব্যয়ভার বহন করতে পারে।

অধ্যায় ৫

প্রতিরোধ: আইএফজে এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলো যা করতে পারে

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিবেকবর্জিত এবং সংকল্পবদ্ধ শত্রুরা সাংবাদিকদের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হলে তাদের ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতি বছর বহু সাংবাদিক লক্ষ্যবস্তু, হামলার শিকার বা খুন হন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সাংবাদিক, তাদের ইউনিয়ন এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো আত্মরক্ষায় অক্ষম। বাস্তবতা বরং এর একেবারেই বিপরীত।

মিডিয়া কর্মীদের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে গত পনেরো বছরে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে যা ক্রমেই আরো বেশি করে কার্যকর হচ্ছে। এ আন্দোলনের অন্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলাকারী ও হত্যাকারীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং গণমাধ্যমকে রক্ষার দায়িত্বে অবহেলা কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সাংবাদিকদের কাজের জন্য প্রতিকূল করে তোলার জন্য সরকারকে দায়ী করা।

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কী কী করা হচ্ছে, সাংবাদিকরা আরো কী করতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি মিডিয়া এজেন্ডার শীর্ষে স্থান দেওয়ার জন্য কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই অধ্যায়ে তা তুলে ধরা হয়েছে।

অনেক সময় শুধুমাত্র ঐক্যই সাংবাদিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবচাইতে কার্যকর হাতিয়ার। সার্বিয়ার ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ভিওকান রিস্টিচের বিষয়টি দেখা যাক। রিস্টিচ ১৯৯৯ সালে বেটা নিউজ এজেন্সি, ডানাস এবং ডয়চে ভেলে রেডিওসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের হয়ে কসোভো সংঘাতের খবর সংগ্রহ করছিলেন। কাজ করতে গিয়ে তিনি স্লোবোদান মিলোসেভিচ সরকারের রোষানলে পড়েন এবং সার্বিয়ায় ন্যাটোর বোমা হামলা শুরু হলে তাকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। এক মাস পর তিনি মুক্তি পান। ওই সময় কারা কর্তৃপক্ষ আইএফজে-র সাধারণ সম্পাদক আইডান হোয়াইটের একটি বার্তা তাকে দেন। সেটি ছিল রিস্টিচের মুক্তি দাবি করে সার্বিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের কাছে পাঠানো টেলিগ্রামের কপি।

আন্তর্জাতিক চাপেই যে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে রিস্টিচের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাকে যারা গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেছিল ওই চাপের কারণেই তারা বুঝতে পারে যে সার্বিয়ার বাইরেও এমন লোক আছে যারা রিস্টিচকে আটক করার কথা জানেন এবং তার ভালোমন্দের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

আইএফজে, সাংবাদিকদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে), দি ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট (আইপিআই), রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ), আর্টিকেল ১৯ সহ স্বাধীন সাংবাদিকতার পক্ষে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠন প্রতিনিয়ত যে তৎপরতা চালিয়ে থাকে ওই টেলিগ্রাম ছিল তারই অংশ।

আটক সাংবাদিকের নিরাপত্তা, কারারুদ্ধ সাংবাদিকের মুক্তি এবং হামলার ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে প্রতি সপ্তাহেই সংগঠনগুলো অসংখ্য ফ্যাক্স, ই-মেইল ও চিঠি

পাঠিয়ে থাকে। ঐক্যের এই বহিঃপ্রকাশ কারারুদ্ধ ও হামলার শিকার সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা বিস্মৃত নন।

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক সংগঠনগুলো সাংবাদিকদের ভীতি প্রর্দশন এবং সহিংসতা থেকে রক্ষার উপায় খুঁজতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে। যেখানে সাংবাদিকদের স্থানীয় ইউনিয়ন বা সংগঠন তাদের অধিকার রক্ষায় নিজেরা সোচ্চার হতে পারে না সেখানে আইএফজে-র মতো আন্তজার্তিক সংগঠনগুলোকেই তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আইএফজে বিশ্বে সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন। ১২০ টি দেশের ছয় লাখ রিপোর্টার, সম্পাদক, ফটো সাংবাদিক এবং সম্প্রচার সাংবাদিক এর সদস্য। এ সংগঠনটি সাংবাদিকদের নিরাপত্তার মান উন্নত করার জন্য বিশ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আইএফজে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এক্সচেঞ্জ (আইএফইএক্স) নেটওয়ার্কের একটি অংশ। এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশ ও সাংবাদিকদের সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এমনকি জাতিসংঘ পর্যায়েও উদ্যোগ নিতে পারে।

সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেস্কো আইএফজে-কে 'অ্যাসোসিয়েট রিলেশন্স' এর মর্যাদা দিয়েছে যা বেসরকারি কোন সংস্থার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বীকৃতি। মিডিয়া কর্মীদের হত্যাকে নিন্দা ও অপরাধীদের বিনা বিচারে পার পেয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য আইএফজে সরকারকে তাগিদ দিতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময়

কাজ করতে গিয়ে সমস্যাগ্রস্থ বা বৈরী হস্তক্ষেপের সম্মুখীন সাংবাদিকদের সাহায্য করার জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা প্রণয়নে আইএফজে সদস্য সংগঠনগুলোকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আইএফজে-র সুপারিশ হচ্ছে মানবাধিকার ও নিরাপত্তা ইসু সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক সদস্য সংগঠন একজন করে কর্মকর্তাকে নিয়োগ করবে এবং নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে প্রস্তুতি নেবেঃ

- সমস্যা ও বিপদ সম্পর্কে সদস্যদের সচেতনা বাড়ানো।
- জরুরি পরিস্থিতিতে কী কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আগাম ব্যবস্থা করে রাখা।
- সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কার দায়িত্ব কী হবে সে সম্পর্কে নিয়োগকর্তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা।

সংকটের সময় সাংবাদিকদের সাহায্য করার জন্য সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি জরুরি। তবে এ ক্ষেত্রে সমস্যাকে খাটো করে দেখা বা অতিরঞ্জন করা যাবে না (অতিরঞ্জন থেকে অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হতে পারে এবং তা ভবিষ্যৎ প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ব্যাহত করে)। সংকটের শুরুর দিকে কয়েকঘন্টা উত্তেজনাপূর্ণ থাকে, সেজন্য ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি কমাতে আসলে কী ঘটছে তা জানাটা জরুরি।

তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিটি ঘটনার কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে সে ব্যাপারে আইএফজে-র একটি আদর্শ নীতিমালা রয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, প্রকৃত ঘটনা জানা। এরপর সমস্যাকবলিত সদস্য সাংবাদিককে কীভাবে সাহায্য করা যায় সে ব্যাপারে ইউনিয়নের পরিচালনা পর্ষদ অথবা তার প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সাংবাদিকদের খারাপ বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সে ব্যাপারে সরকার বরাবরই স্পর্শকাতর এবং এ নিয়ে গণমাধ্যমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে। তাই সংবাদমাধ্যম স্বাধীন সাংবাদিকতার শত্রু ও সাংবাদিক নিপীড়নকারীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। তবে সংবাদ মাধ্যমের এই প্রতিবাদকে যদি বিশেষ কোনো পক্ষ সমর্থন অথবা বিপদের অতিরঞ্জন হিসেবে দেখা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও ঝুঁকি থেকে যায়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠন জড়িত হলে সরকার সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতে পারে। তাই ঘটনা বা তথ্যের যথাযথ উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ।

আইএফজে-র কর্মপরিকল্পনায় বেশ কিছু পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে পর্দার অন্তরালে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এই কাজটি করে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশের ইউনিয়ন বা অ্যাসোসিয়েশন। এরপর আইএফজে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে অপ্রকাশ্য চাপ প্রয়োগ করে। এতে করে প্রচারবিহীন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ শুরু হতে পারে। এতেও কাঙ্খিত ফল পাওয়া না গেলে আইএফজে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় আন্দোলনকারী অন্যান্য গ্রুপ প্রকাশ্য প্রতিবাদের আয়োজন করে।

আর যেসব দেশে অব্যাহতভাবে স্বাধীন সাংবাদিকতাকে অবজ্ঞা করা হয় অথবা সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে আইএফজে সাধারণত সেখানে তথ্যানুসন্ধান মিশন পাঠিয়ে থাকে। বাইরের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট দেশে গিয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং আইএফজে তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তবে খুব খারাপ পরিস্থিতিতে আইএফজে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ বা অন্য যথাযথ সংস্থার মাধ্যমে সমন্বিত কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করে।

আইএফজে তাদের অন্য সদস্য ও সংগঠনের ঠিকানা সদস্য ইউনিয়নগুলোকে সরবরাহ করে যা তাদের সাহায্য করতে পারে। সেই সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পাঠানোর উপযোগী চিঠির নমুনা সরবরাহ করা হয়। যেসব সাংবাদিককে পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে আইএফজে-র নিরাপত্তা তহবিল।

দেশের ভেতরে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় আইএফজে দেশের ভেতরে থেকেই কাজ করেন এমন সাংবাদিকদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের আয়োজনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখে থাকে। ওই সব সাংবাদিকরা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ প্রতিবেদকদের জন্য প্রায়ই আয়োজন করা হয় এমন নিরাপত্তা বিষয়ক কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ সাধারণত পান না। ওই প্রশিক্ষণে কয়েকদিনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয় এমন অপেক্ষাকৃত ছোটো কিছু কোর্স থাকে যাতে যতবেশি সম্ভব সাংবাদিক এতে যোগ দিতে পারেন। বিভিন্ন ধরণের সংঘাতের খবর সংগ্রহের সময় সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যা মোকাবেলার জন্য কোর্সের বিষয়বস্তু রদবদল করা হতে পারে।

IFJ
IJF

বাংলাদেশে আদালত প্রাঙ্গনেও সাংবাদিকরা হামলার শিকার হয়ে থাকেন। আটক ব্যক্তিরা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সামনেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। (বোয়ালিয়া থানা, রাজশাহী, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৭) ফটো: ইকবাল আহমেদ/দৃকনিউজ

আইএফজে-র প্রথম কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ম্যাসিডোনিয়ার ওরিদে। ওই অঞ্চলের ২৩ জন সাংবাদিক এতে অংশ নেন। কাউন্সিল অব ইউরোপের অর্থানুকুল্যে ম্যাসিডোনিয়া প্রেস সেন্টারের সহযোগিতায় এর আয়োজন করা হয়। ২০০৭ সালে আফগানিস্তানের কাবুলে ৪০ জন সাংবাদিকের জন্য দু'টি নিরাপত্তা বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে আইএফজে।

আইএফজে-র স্থানীয় সহযোগী দি আফগান ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (এআইজেএ) এবং কমিটি টু প্রোটেক্ট আফগান জার্নালিস্টস (সিপিএজে) স্থানীয় সাংগঠনিক সহায়তা দেয়। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইন্সটিটিউট (আইএনএসআই) দিয়েছিল টেকনিক্যাল সাহায্য।
প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে সাধারণত অনেক ধরণের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে থাকে অস্ত্র ও তার প্রতিক্রিয়া, জরুরি চিকিৎসা সেবা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সম্পর্ক, গোলযোগ, মাইন, বুবি ট্র্যাপ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা।

বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা কর্মসূচি

নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের ব্যাপারটির দ্রুত সম্প্রসারণ আইএফজে-কে সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যমী হতে তাড়না যুগিয়েছে। সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণে মুদ্রণ সাংবাদিকতার ব্যর্থতা এবং যেসব সাংবাদিকের আন্তর্জাতিক মিডিয়া সংস্থার কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই তাদের ব্যাপারটি ছিল আইএফজে-র অন্যতম উদ্বেগ।

২০০০ সালের মে মাসে আইএফজে আইপিআই-এর কাছে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দেয় এবং দু'পক্ষ মিলে চারটি সমস্যা চিহ্নিত করেঃ

- নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও উপকরণ খুবই ব্যয়বহুল।
- এগুলো বেশি প্রয়োজন যেসব সাংবাদিকের তার অনেকেই ফ্রিল্যান্স।
- সহিংসতার শিকার যারা হন তাদের বেশিরভাগই স্থানীয় সাংবাদিক যাদের মাতৃভাষায় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নেই।
- ঝুঁকি সচেতনা এবং চাপ ও আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ-সম্বলিত একটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের কাছে নেই বললেই চলে।

আইএফজে পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন, নিয়োগকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলো মিলে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে যার কাজ হবে এরকমঃ

- সাংবাদিক ও অন্য মিডিয়াকর্মীদের জন্য সংশ্লিষ্ট ভাষায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করা।

- তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া।

- একটি র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট গঠন করা যারা সংঘাত চলছে এমন স্থানে সাংবাদিক ও অন্য মিডিয়াকর্মীদের জন্য একটি ইউনিট স্থাপনের কাজ করবে। এ ইউনিট জাতীয় এবং আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করবে।

- স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের মেডিক্যাল কিট, নিরাপত্তার জন্য ফ্ল্যাক জ্যাকেট ও হেলমেট সরবরাহ করা।

- মিডিয়াকর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ইউনেস্কো, রেড ক্রস ইত্যাদি) প্রচারণা চালানো।

২০০২ সালের নভেম্বরে পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারী গ্রুপ, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সাংবাদিকদের সংগঠনের একটি জোট আইএনএসআই প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। ২০০৩ সালে এ ইন্সটিটিউট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

জাতীয় সংগঠনগুলোর ভূমিকা

বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ইউনিয়ন ও সংগঠনগুলোই বেশিরভাগ আন্দোলন করে থাকে। প্রাত্যহিক কাজের অংশ হিসেবে তারা এ কর্মকাণ্ড চালায়। সাংবাদিকদের সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে একটি আঞ্চলিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংহতির মাধ্যমে সাংবাদিক ও মিডিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের অনেক উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনার নজির আছে। সংহতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নানারকম হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মঘট ও রাজপথে বিক্ষোভ থেকে শুরু করে চিঠি লেখা অভিযান, সংবাদ সম্মেলন ও পর্দার অন্তরালের তদবির-তৎপরতা। তবে নির্দিষ্ট সময়ে পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যা কতটুকু গুরুতর তার ওপরই আন্দোলনের ধরণ নির্ভর করে। তা ছাড়া আন্দোলন ছোট আকারে শুরু হয়ে তা বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়া তো সবসময়ই সম্ভব।

এটি প্রমাণিত সত্য যে, সাংবাদিকরা এক হয়ে যৌথভাবে কাজ করলে তারা সফল হন। সংহতি সাংবাদিকদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় আর এটি তাদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করে। এমনকি নিহত, আহত বা কারাবন্দী সাংবাদিকের পরিবারকে সাহায্যের জন্য চাঁদা তোলার মতো সাধারণ সংহতির ঘটনাও মানুষকে কাছাকাছি আনে। আর এর মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে তাদের সচেতন করে।

অনেক দেশের সংগঠন ঐক্যের জন্য কাজ করে যা এই কাজটিকে সম্ভবপর করে। তবে এ ধরণের সমঝোতা সবখানে অর্জন করা যায়নি। সংগঠনগুলো বিভক্ত হলে এবং একত্রে কাজ না করলে সাংবাদিকদের আন্দোলনের সক্ষমতা কমে যায়। যে সাংবাদিকরা একত্রে আন্দোলন করেন রাজনৈতিক বা জাতিগত ব্যবধান সত্ত্বেও তারা এমন একটি শক্তিশালী সংহতি গড়ে তুলতে পারেন যা সবাইকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকিটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসে সমাজে সাংবাদিক ও স্বাধীন মিডিয়ার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, অন্য বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে মিডিয়ার স্বার্থ যুক্ত করা, রাজনৈতিক পক্ষপাত ও বাণিজ্যিক চাপ থেকে। কৌশলগত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবেঃ

- জীবন এবং স্বাধীনতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না।
- চাকরির নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবেন না।
- আচরণবিধি ও পেশাগত নৈতিকতার ব্যাপারে একটি সম্মত প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা দরকার।
- সর্বোপরি, ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলুন। এগুলো শুনতে সামান্য ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু এটা অর্জন করা কঠিন কাজ। আর বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ এটাই।

FIP
IFJ
FIJ